দাম : বারো টাকা

গুরু নানকের জন্মদিনে
ঘায়েল বিরোধীরা
— পৃঃ ১৪

স্বস্তিকা

ভারতের আরাধ্য পুরুষের
কারামুক্তির দিন ৬ ডিসেম্বর
— পৃঃ ২৩

৭৪ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা।। ৬ ডিসেম্বর, ২০২১।। ১৯ অগ্রহায়ণ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩।। website : www.eswastika.com

শ্রীরামচন্দ্রের কারামুক্তির ২৯ বছর

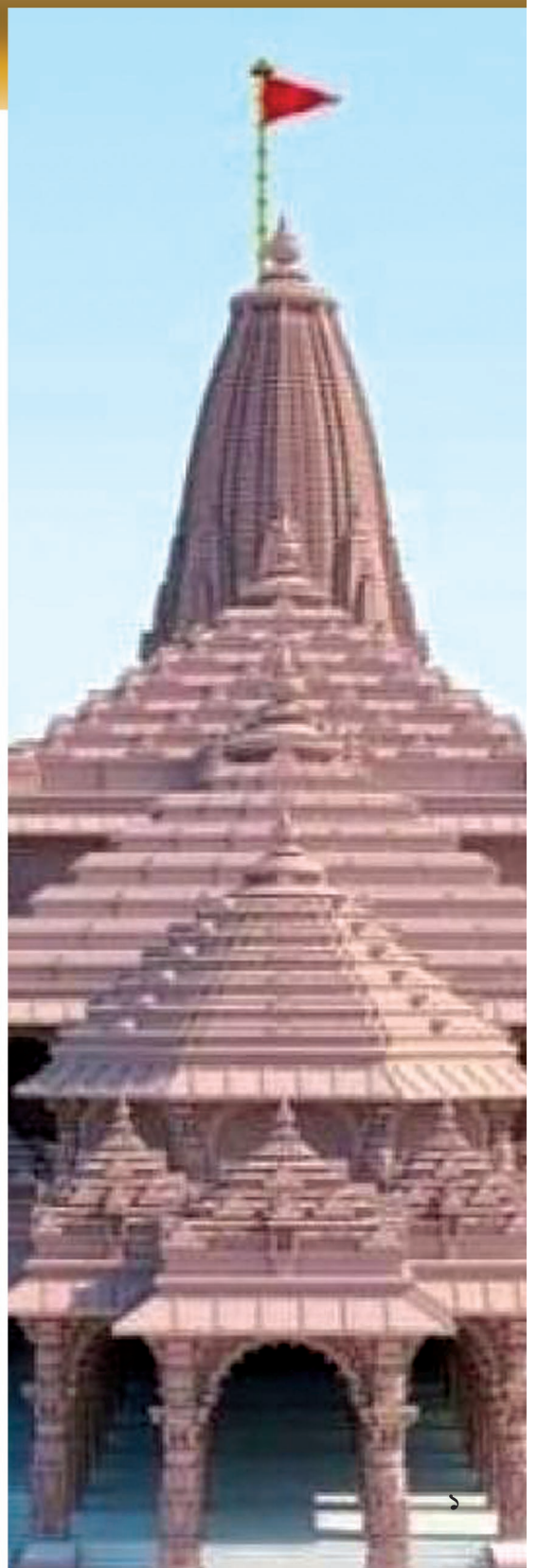

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৬ ডিসেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

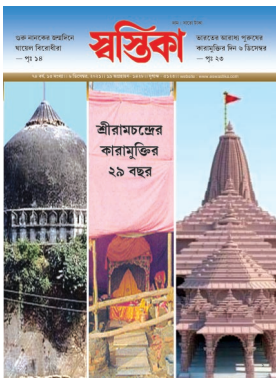

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

কার্যকারী সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'মোদী-মমতার রহস্য জোটে' ফেঁসে সব দল, ভাঙন বিরোধী শিবিরে □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

আন্তর্জাতিক তৃণমূল কংগ্রেস □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

দেশের মানুষের কাছে আমাদের সংবিধান শ্রেষ্ঠ আলোকবর্তিকা □ মেনকা গুরুস্বামী □ ৮

ত্রিপুরায় নির্বাচনী ফল সন্ত্রাসের গল্পকে সমর্থন করে না □ বিশ্বামিত্র □ ১০

ভারত টিকাকরণের সাফল্যের শিখরে □ নারায়ণ চক্রবর্তী □ ১১

বিজ্ঞান শিক্ষায় ঔপনিবেশিক দাসত্বের ইতিহাস □ পিন্টু সান্যাল □ ১৩

গুরু নানকের জন্মদিনে ঘায়েল বিরোধীরা □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ১৪

কৃষি আইন প্রত্যাহার একটি সময়োচিত সিদ্ধান্ত □ সুজিত রায় □ ১৬

নিরাপত্তার কারণে প্রত্যাহৃত কৃষিবিল □ সুদীপনারায় ঘোষ □ ১৮

কৃষি আইন দেশের পক্ষে এক জরুরি পদক্ষেপ ছিল □ মন্দার গোস্বামী □ ২০

ভারতের আরাধ্য পুরুষের কারামুক্তির দিন ৬ ডিসেম্বর □ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠি □ ২৩

কলঙ্ক পেরিয়ে রামরাজ্যে ফিরছে দেশ □ হীরক কর □ ২৬

সনাতন সভ্যতার প্রতিরূপ হয়ে উঠবে রামমন্দির □ অনামিকা দে □ ২৯

মহাকবি কালিদাসের মৃত্যুরহস্য □ ড. অশোক দাস □ ৩১

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রমে রাম বিদেশি, রাবণ ভারতীয় □ সূর্যশেখর হালদার □ ৩৪

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চাই নতুন নীতি প্রণয়ন □ আনন্দ দেবশর্মা □ ৪৩

জোতদারের লাভ, চাষির ক্ষতি □ দীপ্তাস্য যশ □ ৪৪

নোবেল-এর দরবারে বাক্‌স্বাধীনতার স্বীকৃতি □ সনাতন রায় □ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ সমাবেশ সমাচার : ৪৮ □ রাশিফল : ৪৯ □ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৩ ডিসেম্বর
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৩ ডিসেম্বর
২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নতুন চেহারায় করোনা কি আবার ফিরছে?

'ওমিক্রন' নামটা অনেকে শুনেছেন, অনেকে শোনেনইনি। নভেম্বর মাসের গোড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া গেছে করোনা ভাইরাসের এই নতুন ভ্যারিয়ান্ট। ইতিমধ্যেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওমিক্রনকে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, ওমিক্রনকে প্রতিহত করতে ভারত কী ব্যবস্থা নিয়েছে? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে ওমিক্রন নিয়ে এরকম অজস্র প্রশ্নের উত্তর।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

With Best Compliments from :

A
WELL WISHER

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

৬ ডিসেম্বর কলঙ্কমোচনের দিন

ভারতবর্ষ সোনার দেশ। এই দেশের মাটিতে সোনা ফলিত। তাহারই লোভে বিদেশি লুঠেরার দল এই দেশ আক্রমণ করিয়াছে, লুণ্ঠন করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে তাহারা এই দেশ দখল করিয়াছে। এই দেশের শ্রদ্ধার কেন্দ্রবিন্দুগুলি ধ্বংস করিয়াছে। মাতা-ভগ্নীর সম্ভ্রম লুঠ করিয়াছে। শত শত মন্দির ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া তৎস্থলেই মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে। হিন্দুদের জীবনে তাহারা অভিশাপ নামাইয়া আনিয়াছিল। তাহারা অত্যাচারের চরম সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও এই দেশের স্বাভিমানী বীর সন্তানরা তাহাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহারা বারে বারে লড়াই করিয়াছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন। বিদেশি দস্যুদের ব্যতিব্যস্ত রাখিয়াছেন। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে তুর্কি, পাঠান, মুঘলরাই সব কিছু নহে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তাহা 'মধ্যরাত্রের দুঃস্বপ্ন মাত্র'। বস্তুত, ভারতবর্ষের ইতিহাস সতত সংগ্রামের ইতিহাস। দীর্ঘ সংগ্রাম ও বহু প্রাণ বলিদানের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশবাসী ভাবিয়াছিল এইবার বিদেশি আক্রমণের কলঙ্কচিহ্নগুলি অপসারিত হইবে, হিন্দুরা তাহাদের শ্রদ্ধার স্থলগুলিতে আরাধ্য দেবতার পূজার অধিকার পাইবে। হিন্দুদের দুর্ভাগ্য,বিদেশি সংস্কৃতিতে জারিত স্বাধীন ভারতের শাসককুল তাহা উপেক্ষা করিয়াছে। তাই স্বাধীন ভারতেও রামমন্দির উদ্ধারের আন্দোলনে রামভক্তদের প্রাণ দিতে হইয়াছে। কলকাতার রামকুমার ও শরদকুমার কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়কে অযোধ্যায় করসেবা করিতে যাইয়া পুলিশের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। শুধুমাত্র রামমন্দিরের জন্য আবেদনের পর আবেদন, আন্দোলনের পর আন্দোলনে ধৈর্য হারাইয়া লক্ষ লক্ষ ক্রুদ্ধ হিন্দু জনতা ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যার রামমন্দির স্থলে নির্মিত বাবরি ধাঁচার কলঙ্কচিহ্ন অপসারণ করিয়া এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে।

দুঃখের বিষয় হইল, বাবরি ধাঁচা অপসারণের অব্যবহিত পরেই তথাকথিত সেকুলার ও বামপন্থীরা জিহাদি শক্তিকে প্রোৎসাহিত করিয়া দেশ জুড়িয়া দাঙ্গার সৃষ্টি করিয়াছিল। বস্তুত, ইহারা কোনোদিনই দেশের মধ্যে স্বদেশ খুঁজিয়া পান নাই। আগাগোড়া তাহাদের কর্মকাণ্ড দেশবিরোধিতায় পরিপূর্ণ। তাহারা অপমান ও স্বাভিমানের পার্থক্য করিতে পারেন না। তাহারা মর্যাদাপুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে স্বীকার করেন না। তাহারা দেশের গৌরবে গৌরববোধ করেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাদেরই কটাক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন–' নিজের দেশের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ এইরূপ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জানিলে, কোথা হইতে আমরা প্রাণ আকর্ষণ করিব? এইরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না — ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি, পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না, এবং এখন আমাদিগকে অশনবসন আচারব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। যে সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দেয়, আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদ্গার-কাল পর্যন্ত যে-কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে কুহেলিকা; তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে মাত্র।' ভারতবাসীর সৌভাগ্য, দেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রকৃত ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া এবং যথাযথ সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করিয়া রামজন্মভূমি স্থলেই রামমন্দির নির্মাণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহাতে সত্যেরই জয় হইয়াছে। রাষ্ট্রভক্ত দেশবাসী মনে করেন এইভাবেই মথুরার শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থান ও কাশী বিশ্বনাথ-সহ দেশের কয়েক হাজার মন্দিরের পুনরাধিকার তাহারা অর্জন করিতে পারিবেন। আরও সৌভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে কুহেলিকাচ্ছন্ন ইতিহাস স্বপ্রকাশ হইতে শুরু করিয়াছে। দেশবাসী অনুভব করিতেছেন, নূতন ভারতের জয়যাত্রা শুরু হইয়াছে। ৬ ডিসেম্বর সেই জয়যাত্রার একটি মাইলফলক।

সুভাষিতম্

গচ্ছন্ পিপীলিকো যাতি যোজনানং শতান্যপি।

অগচ্ছন্ বৈনেতেয়ঃ পদমেকং ন গচ্ছতি।।

চলতে থাকলে পিপীলিকা শতযোজন অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু না চললে গরুড়পক্ষী এক পা-ও অগ্রসর হতে পারে না।

‘মোদী-মমতার রহস্য জোটে’ ফেঁসে সব দল, ভাঙন বিরোধী শিবিরে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এপ্রিল (২০-২১) মাসের ব্যবসা সম্মেলনে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে বিরোধী শিবির। তারা ভাগ হয়ে গিয়েছে। মোদী বিরোধী ১৬টি রাজনৈতিক দল একদিকে। নেতৃত্বে কংগ্রেস। অন্যদিকে মমতা। সঙ্গে বহুজন সমাজ পার্টি আর কেজরিওয়ালের আম আদমি দল।

নিশ্চুপ রাজ্যের বিজেপি নেতারা। সদুত্তর খুঁজতে তারা ব্যাগ হাতড়াচ্ছেন। দুর্বল যুক্তির তত্ত্ব খাড়া করছেন। ‘মুখ্যমন্ত্রী তো প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতেই পারেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?’ ২০১৩-তে রাজ্যের নতুন শিল্পনীতি গ্রহণের পর থেকে ৬টি শিল্প সম্মেলন করেছেন মমতা। ২০১৬ সালে তা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের রূপ নেয়। ২০১৪ সালে মোদী ক্ষমতায় আসেন। মমতা কখনো নিজে গিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ করে আসেননি।

বিজেপির প্রয়াত নেতা অরুণ জেটলি একবার অংশগ্রহণ করেন। অরুণের সঙ্গে মমতার সখ্য সর্বজনবিদিত। যেমন ছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে। এনডিএ-১-এর অংশ ছিলেন মমতা। দিল্লিতে সাংবাদিকতা করার সময় সে সখ্য আমি দেখেছি। মমতা-মোদীর জোট ঘিরে কেবল ক্ষয়িষ্ণু বামপন্থীরাই আনন্দে আছেন। বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন তাঁদের বহুদিনের তত্ত্ব— ‘দিদি-মোদী সেটিং’ আছে মান্যতা লাভ করেছে।

তবে বেল পাকলে কাকের কী? শুধু এ রাজ্যই নয় সারা দেশেই অকিঞ্চিৎ হয়ে গিয়েছেন বামেরা। তাই রাজনৈতিকভাবে তারা মূল্যশূন্য। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন বিজেপিকে আটকাতে মমতাই একমাত্র ভরসা। তা নিয়ে দলের অভ্যন্তরে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে।

সিপিএমের অন্যতম জন্মদাতা ইএমএস নাম্বুদরিপাদ কোনো সময় একবার বলেছিলেন, ‘জাতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসের কোনো বিকল্প নেই’। আগুনে ঘি পড়েছিল। তা নিয়ে দলের ভিতর বাইরে বিস্তর জল ঘোলা হয়। বকলমে তিনি একপ্রকার সেনসর হন। ইএমএস যে ঠিক ছিলেন তা বুঝতে ২০০৪ পর্যন্ত বাম নেতাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বামেদের সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস কেন্দ্রে সরকার গড়েছিল।

যদিও সে জোট টেঁকেনি। ২০০৮-এ খতম হয়ে যায়। পরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ সংসদে অভিযোগ করেন বামেরা কংগ্রেস দল আর দেশকে চার বছর ধরে ‘ব্ল্যাকমেল’ করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতার ডাকে পশ্চিমবঙ্গে মোদীর আগমন সেরকম কিছু একটা ঘটিয়েছে বলে আমার ধারণা। সেটা কী তা পরে বোঝা যাবে। আপাতত এই অঙ্কই শিরোধার্য যে মোদী আর মমতার মধ্যে কোনো এক রাজনৈতিক অঙ্ক আছে যা বোঝা যায় কিন্তু সঠিকভাবে ধরা যায় না। কিছু এলোমেলো তদন্তের ঘটনার নমুনা তুলে এই রাজনৈতিক সম্পর্কের ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। যা একেবারেই ভিত্তিহীন বলে আমার মনে হয়।

এই মুহূর্তে মমতার কাছে দিল্লি আর মোদী দূর অস্ত। অথচ সোনিয়া তাঁর নাগালের মধ্যে। তাই নিভু নিভু কংগ্রেসের কফিনে শেষ পেরেক আর প্রদীপ জ্বালাতে তিনি আসরে নেমেছেন। গোয়া, ত্রিপুরা, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশে বা বিজেপি শাসিত অন্য রাজ্যে তাঁর বিজেপিকে টক্কর কেবল নামকাওয়াস্তে। আসল উদ্দেশ্য ‘কংগ্রেস খতম’।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে রাজ্যের দাবিদাওয়া নিয়ে বহুবার দেখা করেছেন। কিন্তু এবারের বৈঠক কিছুটা অন্য বলেই আমার ধারণা। প্রধানভাবে মমতা যখন মোদীকে ছেড়ে দিয়ে সোনিয়ার বদলি মুখ আর তাঁর দল তৃণমূল জাতীয় কংগ্রেসের পালটা দল হিসেবে উঠে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মোদী আর মমতা উভয় কংগ্রেস মুক্ত ভারত চান। তবে কারণ আলাদা। এখন মোদীর বয়স ৭২। মমতা ৬৭। দলের সাংগঠনিক নিয়মানুসারে মোদীকে ৭৫-এ অবসর নিতে হবে। মমতার নিজের দল। তাই ওসবের বালাই নেই। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের সময় মোদীর বয়স হবে ৭৪। আর মমতা প্রায় ৭০। আমরা ধারণা রাজনীতি ছেড়ে দেশের কাজে ফিরে যাবেন মোদী। যদি এই মূল্যায়ন ভুল হয় আমি মাথা পেতে মেনে নেব। তবে চলে যাওয়ার আগে তাঁর স্বপ্ন ‘কংগ্রেস মুক্ত’ ভারত দেখে যেতে চান মোদী। তাই হয়তো মমতাকে সামনে রেখেই তাঁর ‘সেকেন্ড লাইন’ খুলে রাখতে চান মোদী। মমতার জন্ম কংগ্রেসে। তিনি ওই দলের নাড়ি নক্ষত্র জানেন। তাই তাঁকে দিয়েই ‘কংগ্রেস বধ’ করতে চান মোদী।

এই মুহূর্তে মমতার কাছে দিল্লি আর মোদী দূর অস্ত। অথচ সোনিয়া তাঁর নাগালের মধ্যে। তাই নিভু নিভু কংগ্রেসের কফিনে শেষ পেরেক আর প্রদীপ জ্বালাতে তিনি আসরে নেমেছেন। গোয়া, ত্রিপুরা, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশে বা বিজেপি শাসিত অন্য রাজ্যে তাঁর বিজেপিকে টক্কর কেবল নামকাওয়াস্তে। আসল উদ্দেশ্য ‘কংগ্রেস খতম’। হচ্ছেও তাই। সে কাজ তিনি শুরু করেছেন। তাই মোদী খুব খুশি। মমতার আমন্ত্রণে কলকাতায় আসছেন। ২০২২-এর এপ্রিলের পর নতুন কী ‘খেলা হবে’ এখন সেটাই দেখার। □

আন্তর্জাতিক তৃণমূল কংগ্রেস

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা

শীত আসছে। বাতাসে খেজুর গুড়ের গন্ধ আছে কি না তবে তৃণমূল ভবনে প্রাক শীতেই উৎসবের আমেজ। আসলে এটাই তো তৃণমূলের ঋতু। সামনে মেলা আর মেলা। মেলা হবে। খেলা হবে। তবে এবার খেলা বাঙ্গলার বাইরেও হবে। তৃণমুল আগামীদিনে গোটা দেশের দল হতে চলেছে। এ খবর রটে গিয়েছে। ত্রিপুরায় দ্বিতীয় হওয়ার পরে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গোয়ায় দ্বিতীয় হওয়ার লড়াই। একটা সময়ে বাম নেতারা বলতেন স্কুলের গরমের ছুটির পরেই বিপ্লব এসে যাবে। আসত না। বলা হতো পুজোর ছুটির পরে নিশ্চিত। সোভিয়েত দেশ থেকে বিপ্লব রওনা দিয়ে দিয়েছে। সে বিপ্লব আজও আসেনি। সিপিএম চলে গেছে। সব জায়গা থেকেই চলে যাচ্ছে।

কিন্তু ত্রিপুরা থেকে যে তারা যায়নি এমন দাবিতে সরব বামেরা। ত্রিপুরার পুরভোটের ফল প্রকাশের পরে দেখা গিয়েছে, বিজেপি একচ্ছত্র ভাবে প্রায় সব আসনেই জয়ী হয়েছে। গেরুয়া ঝড়ের সামনে বাম আর তৃণমূলকে অসহায় দেখা গিয়েছে। তবে, তৃণমূলের ঝুলিতে ভোট কিন্তু অনেকটাই বেড়েছে। তাই তো ঘাসফুল শিবির উজ্জীবিত, এত উত্তেজিত। ত্রিপুরার গণনার পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ট্যুইট করে বলেছেন, 'তৃণমূলই এখন ত্রিপুরার প্রধান বিরোধী শক্তি।' কিন্তু সত্যিই কি

এখন দিকে দিকে আমরা বাড়ছি। ভারতের আনাচে-কানাচে বাড়ছি। আমরা আন্তর্জাতিক স্তরে স্থান পাবো।...

তাই! তাহলে কি সত্যিই তৃণমূল ত্রিপুরায় বামেদের সরিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে? একটু বলে দিই, তৃণমূল বেশ কিছু ওয়ার্ডে ভোট পেয়েছে। আগরতলার ৫১টির মধ্যে ২৬টি ওয়ার্ডে ভোটের হারে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে এবং আমবাসায় একটি ওয়ার্ডে জয়ও পেয়েছে।

কিন্তু এর মানে কি ত্রিপুরায় তৃণমূল দ্বিতীয়? গণতন্ত্রে ৪৯ আর ৫১-র মধ্যে ফারাক অনেক। একজন পরাজিত। একজন জয়ী। তাই কতটা ভোট পেল তাতে কিস্যু আসে যায় না। সেটাই যদি হতো তবে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের হিসেবে বিজেপি ১২১ বিধানসভা এলাকায় জয়ী। কিন্তু বাস্তবে কী? বাস্তবে বিজেপি জিতেছে ৭৫ আসনে। হ্যাঁ, সেই আসন পেয়েই বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়। আচ্ছা, নন্দীগ্রামে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল দ্বিতীয়? না কি পরাজিত? পরাজয় মানতে পারাটা জয়ের থেকে বড়ো বিষয়।

ওসব থাক। এখন দিকে দিকে আমরা বাড়ছি। সরি। তৃণমূল বাড়ছে। গোটা দেশ একদিন জোড়া ফুলের দখলে আসবে। আসবেই। কারণ, যুবরাজ বলেছেন। কিন্তু কারা সেই সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন? পরিবারের লোক বাড়াতে হবে। আমাদের এমন অবস্থা যে কলকাতায় ১৪৪ ওয়ার্ডে প্রার্থী দিতে গিয়ে ছ'জন বিধায়ককে বাছতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন আবার অনেকগুলো দপ্তরের মন্ত্রী। একজন সাংসদও প্রার্থী হয়েছেন। কিন্তু তাতে কী? আইনে তো কোনও বাধা নেই। হতেই পারেন। তবে প্রশ্ন একটাই। তৃণমূলে নেতাদের ঘাটতি চোখ পড়িয়ে দিল। তবে পরিবারবাদ জিন্দাবাদ। অনেক নেতার ছেলে, মেয়ে, বোন, ছাত্রী প্রার্থী হয়েছেন। আরে বলাই হয়নি যুবরাজের এক কাকিমা মানে আমাদের দিদির বউদিও প্রার্থী হয়েছেন। শুধু মাঠে নয় ঘরে ঘরে খেলা হবে। শীত আসছে। দিকে দিকে মেলা হবে। তৃণমূল নেতাদের এটাই তো ঋতু। মেলার পরে রাজ্যের বাকি জায়গায় পুরভোটের খেলা হবে।

খোঁচা দেবেন না একদম। আজ বাঙ্গলা যা ভাবে, কাল তা ভাবে বিশ্ব। তাই তৃণমূল সর্বভারতীয় হবে। তৃণমূল আন্তর্জাতিক হবে। □

অতিথি কলম

মেনকা গুরুস্বামী

দেশের মানুষের কাছে আমাদের সংবিধানই শ্রেষ্ঠ আলোকবর্তিকা

আমাদের নিজস্ব দায়বদ্ধতা ও সক্ষমতার মাধ্যমে আমরা আমাদের মৌলিক অধিকারের স্বাধীনতাকে কতদূর প্রসারিত করতে পারব তার ব্যবস্থা সংবিধানে নির্ধারিত আছে। সংবিধানের নিজস্ব অদৃশ্য নৈতিকতাবোধ— বঞ্চিত, প্রান্তিক, নারী ও সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় সর্বদা তাদের রক্ষাকবচের কাজ করছে।

আজ থেকে ৭২ বছর আগে ১৯৪৯ সালের ২৭ নভেম্বর এই পত্রিকার পাতা (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস) 'নিউ কনস্টিটিউশান অ্যাডাপটেড' এই শীর্ষ সংবাদ প্রকাশ করে গর্ববোধ করেছিল। এর ঠিক আগের দিনেই তৎকালীন সংযুক্ত গণপরিষদে ঘটে চলা ঘটনাবলী নিয়ে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছিল— 'ঠিক সকাল ১১.০৭ মিনিটে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংবিধান রচয়িতা কমিটির প্রধান ড. বি আর আম্বেদকারের আনা প্রস্তাবটিকে ভোটাভুটির জন্য সংসদে রাখেন। সেখানে লেখা ছিল— constitution as settled by the assembly, be passed'। এর পরই এক সম্মিলিত কলধ্বনির মাধ্যমে গোটা সংসদ সম্মতিতে মুখর হয়ে ওঠে। আমাদের কাগজ বিশদে লিখেছিল সদস্যদের মধ্যে অনেকেই 'বন্দে মাতরম্' এবং 'ভারত মাতাকী জয়' ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। এই ধ্বনি যখন সংবিধান অনুমোদিত হলো এবং যে মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি তাতে সই করলেন সেই দু'টি গৌরবোজ্জল মুহূর্তকেই আবেগঘন করে রেখেছিল।

এই সূত্রে সংবিধানের যে ধারাগুলি নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিল কিংবা একটি তাৎক্ষণিক সংসদ গড়ে তোলা বা কিছু সাময়িক সময়ের জন্য জরুরি কাজ সেগুলি আগেই ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯-এই লাগু করে দেওয়া হয়েছিল। মাথায় রাখতে হবে, সংসদ প্রস্তুত না থাকলে বিল পাশ করবে কে? আরও বহুবিধ বিষয় যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ সংবিধান ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে গৃহীত হয় আমরা জানি।

সংবাদপত্রগুলির শিরোনামে ও অন্যান্য পাতায় পাতায় অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দীর্ঘ তিন বছরের সংবিধান রচনার অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তার চূড়ান্ত পরিণতির খবর উপচে পড়তে থাকে। ২৬ জানুয়ারির গণতন্ত্র দিবসের উন্মাদনা ১৫ আগস্টের চেয়ে কোনো অংশে যে কম ছিল না তা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে মুদ্রিত অক্ষরগুলিতে। তখন তো টিভি ছিল না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, স্বাধীন দেশে এত প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা কেন উঠছে? সদ্য গঠিত গণপরিষদের আমলে তখন যৌথ দায়িত্ব সামাল দিতে হতো। সকালের দিকে বসত সংসদ। যে সদস্যরা সংবিধান রচনার কমিটিতে ছিলেন সংসদে অংশগ্রহণও তাদের অবশ্যই জরুরি কাজ ছিল। সংসদ সমাপ্ত হওয়ার পর বিকেলের দিকে তাঁরা সংবিধান রচনার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতেন। এঁরা অবশ্যই ছিলেন কঠিন পরিশ্রমী ও প্রচারবিমুখ।

স্বাধীনতা অর্জিত হলেও তার বিনিময়ে যে রক্তাক্ত দেশ ব্যবচ্ছেদ হয়েছিল তার ক্ষত তাঁদের মধ্যে একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু এরই মধ্যে সদ্য গঠিত স্বাধীন ভারতকে ঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্বও ছিল তাঁদেরই ওপর। সদ্য উপনিবেশিক শাসনমুক্ত দেশ চালনার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৬-৪৯ এই তিন বছর ধরে লঘুভাবে বা দায়সারা ভাবে তাঁরা যে সংবিধান রচনা করেননি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এটাই, সংবিধান আজও সমানভাবে সক্রিয় ও দিনদিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

দিল্লিতে ব্যাপক উদ্বাস্তু আগমন গণপরিষদের সদস্যদের নজর এড়ায়নি। সংসদের অন্দরে যেখানে গণপরিষদের সদস্যরা সংবিধান রচনা করছিলেন তার ঠিক কয়েক মিনিটের দূরত্বেই অবস্থিত 'পুরানো কিল্লায়' আশ্রয় নিয়েছিলেন বহু ছিন্নমূল মানুষ। রচয়িতারা অনুভব করছিলেন বাস্তব পরিস্থিতির চাপ। প্রতিদিন আমি যখন গাড়িতে সুপ্রিম কোর্টে যাই প্রায়ই সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণটির ছবি যেন মনে ভেসে ওঠে। একটা বর্ণনাতীত অনুভূতি হয় যে তখন কেমন ছিল সেই শহর যে উদ্বাস্তুর আগমনে ক্রমশ উপচে পড়ছে। অন্যদিকে একদল লোক অদূর ভবিষ্যতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম নাগরিকদের জীবন, অধিকার কীভাবে সুরক্ষিত রাখা যায় সেই কাজে দিনরাত নিমজ্জিত। তাঁরাই তো তৈরি করছিলেন ভিত্তিভূমি।

অন্যদিকে সংসদের অভ্যন্তরেও মাথাচাড়া দিচ্ছিল নানা চ্যালেঞ্জ। সেই সময়ের গণপরিষদের নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা ছিল ২৯৬। কিন্তু কিছু সদস্য ভারতীয় সংসদকে পরিহার করেন যাকে বলে বয়কট। পরবর্তী সময়ে তাঁরা পাকিস্তানে চলে যান। এর ফলে পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২১০-এ নেমে আসে। প্রাজ্ঞ-সদস্যেরা হঠাৎ এই বয়ককারীদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হননি। চূড়ান্ত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে ২১০ জনকে নিয়েই প্রারম্ভিক গণপরিষদের অধিবেশনগুলি চালিয়ে যান। অন্যদিকে এই পরিষদত্যাগী সদস্যদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় সংবিধান রচয়িতা দলের চেয়ারম্যান আম্বেদকর বলেন— 'এই ছেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বড়ো আইনি সমস্যা নেই। এটি কোনো আইনি ব্যাপারই নয়। আমরা আইনের দিকটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যারা আসতে চাইছেন না তাদের ফিরে আসার জন্য বোঝালে তারা ফিরে আসবেন। তাঁদের প্রতি আমার তরফ থেকে এই আবেদন রইল যে তাঁরা যাতে ফিরতে পারেন তার অনুকূল ব্যবস্থা আমরা করব।'

এরই মধ্যে কিছুটা মাতব্বরি করে এক সংবিধান বিশেষজ্ঞ ইংরেজ Ivor Jennings, যাঁর সংবিধান রচনার কাজে ঢোকার খুব ইচ্ছে ছিল। স্বাধীন ভারত তাকে যে সুযোগ দেয়নি। তিনি জ্ঞান দিয়ে বললেন, তোমরা সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টা এড়িয়ে যাচ্ছ কেন? গুরুতর প্রশ্ন। দেশ তো সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতেই ভাগ হয়েছিল। এই ধরনের পরিস্থিতিতে গণপরিষদের মহিলা ও পুরুষ সদস্যরা গভীর চিন্তা করে বীরের মতো সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হলেন না। তাঁদের মনন চর্চায় প্রথমেই উঠে এসেছিল 'আমরা কারা' এই প্রশ্নটি। তাঁরা বললেন, 'we the people'। আমরা সকলে নাগরিক, প্রজা নয়। আমাদের জাতিটি হবে সকল নাগরিকদের স্বাধীন চিন্তা করার অধিকার ও তা প্রকাশ করার অধিকার সংবলিত। সকল নাগরিকের থাকবে নিজস্ব বিশ্বাস, ধর্মাচরণের পদ্ধতি। সকলেই পাবে সমান সুযোগ ও সমান সামাজিক অবস্থান।

এই খসড়ার মধ্যে যে সাম্যের বীজ ছিল তা থেকেই উঠে এসেছিল সকলে সমান হওয়ার পথ সন্ধান। অতীতে যারা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে বহু ক্ষেত্রে অচ্ছ্যুৎ হয়েছে, তাদের হৃত সম্মান ও সমান প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে হবে সরকারকে। এ কারণেই এসেছিল সংরক্ষণের তত্ত্ব। কিন্তু আমেরিকার যেখানে শতাব্দীকাল ধরে বলবৎ ছিল অমানবিক দাসপ্রথা তারা নতুন সংবিধানে এই পাপ আদৌ স্খলন করেনি। কোনো মৌখিক ক্ষমাও চায়নি অত্যাচারীতদের কাছে। তাদের জন্য কোনো নতুন অধিকারও দেয়নি। আমাদের নবীন সংবিধানে বলা হলো ধর্ম, জাতপাত, বর্ণ, লিঙ্গ ভেদে বিন্দুমাত্র বৈষম্য করা হবে না। যারা এতদিন অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল নতুন সংবিধান তাদের সবাইকে কাছে টেনে নিল। বিশেষ করে মহিলা, তথাকথিত নীচু জাতি ও সংখ্যালঘুদের সমমর্যাদা দেওয়া হলো।

বাস্তবে এই নির্মাতারা গুণগতভাবে সব একেবারে বিপরীত মেরুর লোক ছিলেন এমনটা নয়। কিন্তু যুগ যুগ ধরে দেশের যে বিরাট অংশের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল তাদের মুখে তারা ভাষা এনে ছিলেন। করলেন অন্যায়ের প্রতিকারের ব্যবস্থা যাতে বঞ্চিতদের আস্থা থাকে সংবিধানে। তবুও এই ৭২ বছরের আয়ুর সংবিধানের সহ্যক্ষমতাকে যেন আমরা সর্বদা পরীক্ষার মুখে না ফেলি। বাস্তবে দীর্ঘদিন অটুট থাকা সংবিধানের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। ১৭৮৯ থেকে ২০০৫ সাল অবধি ২০০টি দেশের ৯৩৫টি সাংবিধানিক প্রণালীকে বিশ্লেষণ করে চার্জেস স্কুল অব 'ল-এর একটি সমীক্ষক দল বলছে গড়ে একটি সংবিধানের আয়ু ১৭ বছর মাত্র। অথচ আমেরিকার সংবিধানই ২৩৪ বছরের পুরনো। অন্যদিকে ফ্রান্সের রয়েছে ১৪টি সংবিধান। মেক্সিকোর ৫টি এবং পাক সংবিধানের ৩টি সংখ্যা বিপুল বৈপরীত্যের প্রমাণ। অর্থাৎ এরা কেউই সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। ছিল দূরদৃষ্টির অভাব।

কিন্তু ভারতের সংবিধান গৌরবোজ্জ্বল ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এর কারণ এর প্রণেতা, ভাষ্যকার, সাংবিধানিক আদালত, অন্যান্য বিচারপ্রার্থী, নানান সামাজিক প্রতিষ্ঠান আন্দোলনের মাধ্যমে অজস্রবার নাগরিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে সংবিধানকে সুরক্ষিত ও পুষ্ট করেছেন। প্রথমে বলা সাংবিধানিক নৈতিকতাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে সর্বদা প্রান্তিক মানুষজন, নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেওয়ার আন্তরিক চেষ্টা করা হয়েছে। উভলিঙ্গদের অধিকার আজ প্রতিষ্ঠিত। তারা স্বাধীনতা পেয়েছে সমানভাবে বাঁচার।

এতকিছু থেকে একটি ধ্রুব সত্যই উঠে আসে যে একে অপরের স্বাধীনতা রক্ষায় নাগরিক দায়বদ্ধতা। এটিই সংবিধানের চালিকাশক্তি। আমার বলার অধিকার যতটা সাংবিধানিক ধাঁচার মধ্যে তোমার প্রতিবাদের অধিকার ততটাই। অভিনন্দন আমার দেশ। উদ্‌যাপিত হচ্ছে সংবিধান দিবস, আমরা একে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(লেখক সর্বোচ্চ আদালতের আইনজীবী)

শোকসংবাদ

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক ভরত কুণ্ডুর বড়দাদা শঙ্করনাথ কুণ্ডু গত ২৫ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিনী, ২ পুত্র ও ১ নাতি রেখে গেছেন।

* * *

মালদানগরের উত্তরায়ণ প্রভাত শাখার স্বয়ংসেবক, সংস্কার ভারতীর সদস্য ও স্বস্তিকা পত্রিকার নিয়মিত পাঠক নিতাই চাঁদ ঘোষ গত ১১ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

* * *

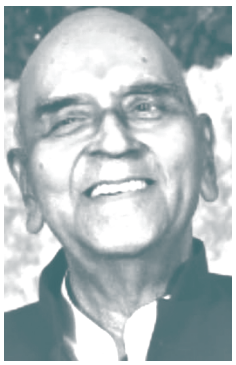

কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক দুর্গাপ্রসাদ নাথানী গত ২৩ নভেম্বর তাঁর আলিপুরস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। শ্রীনাথানী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করার পর কাগজ ও কম্পিউটারের ব্যবসা শুরু করেন। ছাত্রজীবনে তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৬ সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিনিধি রূপে কলকাতা নগর নিগমের পার্ষদ নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালে হাওড়া, ১৯৮৪ সালে কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা ও ১৯৮৭ সালে জোড়াসাঁকো বিধান সভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি কলকাতা কাগজ ব্যবসায়ী সমিতির অধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ কাগজ ব্যবসায়ী সমিতি, চীনাবাজার এবং বি কে শা মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির অধ্যক্ষও নির্বাচিত হন। কুমারসভা পুস্তকালয়, বড়োবাজার লাইব্রেরি-সহ বহু সামাজিক সংগঠনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর থেকে প্রেরণা পেয়ে তাঁর পুত্রবধূ শ্রীমতী ইন্দুনাথানী বহু সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজসেবায় সক্রিয় রয়েছেন।

ত্রিপুরায় নির্বাচনী ফল সন্ত্রাসের গল্পকে সমর্থন করে না

ত্রিপুরায় নাকি 'গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ' করা হয়েছে। বিরোধীদের এমনই অভিযোগ এবং বলাবাহুল্য মারাত্মক অভিযোগও বটে। যদিও ত্রিপুরায় পুর-নির্বাচনের যে পরিসংখ্যান মিলেছে তা আদপেই বিরোধীদের এই অভিযোগের সঙ্গে যায় না। বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখা যাক। বিরোধীদের মূল তির, পুরনির্বাচনে ৩৩৪টি আসনের মধ্যে বিরোধীরা নাকি ১১২টি আসনে শাসক দল অর্থাৎ বিজেপির সন্ত্রাসের কারণে প্রার্থীই দিতে পারেনি। বাদবাকি ২২২টি পুর-আসনের মধ্যে বিজেপি নাকি লাগামহীন সন্ত্রাস করে ২১৭টিতে জয় হাসিল করেছে। বাকি তিনিটি আসন পেয়েছে বামেরা, একটি তৃণমূল, আর একটি আঞ্চলিক দল তিপ্রা। বিজেপির প্রাপ্ত ভোট শতাংশের বিচারে ষাট শতাংশেরও কম, ৫৯.৭৪ শতাংশ। অন্যদিকে বামেরা পেয়েছে ১৯.৪৭ শতাংশ ভোট, তৃণমূল ১৬.৭৭ শতাংশ। অর্থাৎ দুই প্রধান বিরোধী শক্তি প্রায় সাড়ে ছত্রিশ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এছাড়া কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দলের ঝুলিতে আরও প্রায় তিন শতাংশ মতো ভোট গিয়েছে। নিঃসন্দেহে বিজেপি ত্রিপুরায় দারুণ ফল করেছে। এবং প্রায় ৬০-৪০ শতাংশের ব্যবধানে এই ফলাফল মোটেও আশ্চর্যের নয়, অন্তত ফলাফলের নিরিখে গণতন্ত্রেরও এতে বিপন্ন হওয়ার কোনো কারণ ঘটে না। পাঠকের মনে থাকতে পারে, কিছুদিন আগে এরাজ্যের উপনির্বাচনে একমাত্র শান্তিপুর বাদে দিনহাটা, গোসাবা ও খড়দায় তৃণমূল গড়ে ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল, যেটা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের পক্ষে মোটেও কোনো শুভ ইঙ্গিত বহন করছে না। বিশেষ করে, যেখানে সাম্প্রতিকতম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সামান্য ব্যবধানে হলেও জয়লাভ করেছিল। মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে কী এমন ঘটলো যাতে জনগণ দলে দলে তৃণমূলকে ভোট দিলেন! একথা ঠিক, যে উপনির্বাচনের ফল সচরাচর শাসক দলের পক্ষেই যায়। কিন্তু তা বলে ৮৭ শতাংশ? জানা নেই, শ্রদ্ধেয় বরুণ সেনগুপ্ত আজ বেঁচে থাকলে কী বলতেন। বাম-আমলে এই ধরনের অস্বাভাবিক ফলকে তিনি সিপিএমের 'সায়েন্টিফিক রিগিং' বলে চিহ্নিত করেছিলেন? আজ জীবিত থাকলে এরকম কিছুই হয়তো বলতেন।

গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে ফলাফল বিশ্লেষণ করলেই আমাদের বক্তব্যটা মোটামুটি স্পষ্ট হবে। বিজেপি প্রায় বারো শতাংশ মতো ভোট বাড়িয়েছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তাদের প্রাপ্ত ভোট ছিল ৪৭.০৩ শতাংশের মতো। সেই ভোটে প্রাপ্ত ভোট- শতাংশের নিরিখে তৃতীয় স্থানে থাকা বামেরা পেয়েছিল ১৭.৩১ শতাংশ। অর্থাৎ বামেদের ভোট এবারে সামান্য কিছু কমেছে। অন্যদিকে কংগ্রেস গত লোকসভায় ২৫ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেয়েছিল। এবার অকস্মাৎ তারা শক্তি হারানোয় সেই জায়গাটা ক্রমশ তৃণমূল দখল নিয়েছে। এবারে তাদের প্রাপ্ত ষোলো-সতেরো শতাংশ ভোট যে কংগ্রেসরই ভোটব্যাঙ্ক থেকে আমদানিকৃত তা একটা বাচ্চা ছেলেও বুঝতে পারবে। বিরোধীদের নির্বাচনী সন্ত্রাসের গল্প সত্যি হলে বিজেপি এরকম ধীরগতিতে তাদের ব্যালটবাক্সের গ্রাফ উন্নতি করতো না বা বিরোধীদের ভোটব্যাঙ্কে এরকম সামান্য হেরফের হতো না। বরং এবার বিরোধীরা ত্রিপুরার জনগণকে বুঝতে না দিয়ে খুব সুকৌশলে এককাট্টা হয়ে লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিল এবং কিছুক্ষেত্রে তারা আপাতসফলও হয়েছে। যেমন সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে তাদের পরিচালনাধীনে থাকা আগরপাড়া কর্পোরেশনে চারটি পুর-আসনে বামেরা তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয়। উদ্দেশ্য তৃণমূলকে সুবিধে করে দেওয়া। এবং এর ফলও কিছুটা মিলেছে। এর ফলে বিজেপির অপ্রতিহত গতিকে আটকানো যায়নি ঠিকই। কিন্তু অন্তত আগরতলা কর্পোরেশনের ১৮ ও ২০ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির জয়ের ব্যবধান কমেছে। অর্থাৎ এই পুর-নির্বাচনেও লেসার ইভিলের বামমার্গী তাত্ত্বিকরা প্রচণ্ড সক্রিয় ছিলেন। যদিও ত্রিপুরার মানুষ শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রত্যাখ্যানই করেছেন। এবং এই যে ১১২টি আসনে একজন বিরোধী প্রার্থীরও খোঁজ পাওয়া গেল না, তার জন্য দু' দশকের মানিক সরকারের শাসনই মুখ্যত দায়ী। তাই পালটা সন্ত্রাসের গল্প ফাঁদার গরজ বামপন্থীরাও একটু বেশিই দেখিয়েছেন।

যদিও এব্যাপারে প্রকৃত গরজটা তৃণমূলেরই ছিল। ত্রিপুরায় পুর-ভোটের যে ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে তার বিচারে 'লাগামহীন সন্ত্রাসে'র গল্প ধোপে টিকবে না। আসলে এরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন 'প্রধানমন্ত্রী' হওয়ার স্বপ্নে মশগুল। তিনি জানেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। তাই ভারতীয় রাজনীতিতে দ্বিতীয় স্থানটি দখল করতে ('পুওর সেকেন্ড' হলেও) তিনি মরিয়া হয়ে তাঁর একদা মাতৃ-সংগঠন কংগ্রেসকেই ভাঙাচ্ছেন। সোনিয়া-রাহুলের জাঁতাকলে আটক কংগ্রেস কোনো গ্রহণযোগ্য মুখের অভাবে তাদের এই ভাঙন আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রধান বিরোধী হওয়ার বাসনায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৪-এ মোদী-বিরোধী প্রধান মুখ হওয়ার তাগিদে ও অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন-পরবর্তী বেলাগাম সন্ত্রাস থেকে নজর ঘোরাতেই তাঁর দলের সাংসদ, বিধায়ক এমনকী দলবদলুদেরও ত্রিপুরাকে অশান্ত করার কাজে ব্যবহার করেছেন, সন্ত্রাসের গল্পও ফেঁদেছেন। ঠিক যেমন, আগে নির্বাচনে পরাজয় ঘটলে ইভিএম হ্যাকিঙের তত্ত্ব খুব জনপ্রিয় ছিল বিরোধীদের কাছে। কিন্তু কিছু নির্বাচনে সাফল্যের পর তাঁরা বুঝেছেন, এই অপবাদ তাঁদের দিকেও ব্যুমেরাং হয়ে ফিরতে পারে। তাই ত্রিপুরা নির্বাচনে সন্ত্রাসের গল্প শোনা গেল, কিন্তু ইভিএমে কারচুপির সেই 'জনপ্রিয় গল্প'— নৈব নৈব চ! □

ভারত টিকাকরণে সাফল্যের শিখরে

নারায়ণ চক্রবর্তী

পৃথিবীর দ্রুততম জনসংখ্যা বৃদ্ধির দেশ আমাদের ভারত। একশো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের দেশে কোভিডের টিকাকরণ চালানো যে কতটা দুরূহ তা WHO-র প্রতিবেদনেও পরিষ্কার। নভেম্বর, ২০২১-এর শুরুতে, এখনো পর্যন্ত সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে ত্রিশ কোটি মানুষের টিকাকরণের দুটি ডোজ হয়ে গিয়েছে। তাঁরা টিকাকরণ সমাপ্ত হওয়ার শংসাপত্র পর্যন্ত পেয়ে গিয়েছেন। এই সংখ্যাটি মোট টিকাকরণযোগ্য মানুষের ৩০%। এছাড়া দেশের সত্তরকোটি মানুষ টিকাকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন। অর্থাৎ তাঁদের দুটি ডোজের প্রথম ডোজ পাওয়া হয়ে গেছে; এখন দ্বিতীয় ডোজের প্রতীক্ষায়। তাহলে আগামী নব্বই দিনের মধ্যে এদের সবার পূর্ণ টিকাকরণ হয়ে যাবে। অর্থাৎ শুধু যে একশোকোটি মানুষের টিকাকরণ হয়ে গেছে তাই নয়, আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে দেশের ৭০% মানুষের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এতে সময় লাগছে এক বছরের কাছাকাছি। অনেক তথাকথিত 'বোদ্ধা' বলেছিলেন যে ভারতে নাকি আগামী দশ বছরেও টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যাবে না। প্রশাসনিক তৎপরতা, বিশেষত আমাদের ভারতীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চস্তরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও কঠোর তত্ত্বাবধানে এই কাজ করার জন্য সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রাজনীতি বাদ দিয়ে, WHO কিন্তু ভারতে টিকাকরণও কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

ভারতের মতো বিশাল, বিভিন্ন ভাষাভাষী, ঐতিহ্য ও রাজনীতি সচেতন দেশে টিকাকরণের ক্ষেত্রে অসংখ্য বাধা আসার কথা, অবধারিতভাবে তা এসেছেও। আমাদের দেশের বিরোধী রাজনীতি, বিশেষত ইন্দিরা-উত্তর জমানায় ধ্বংসাত্মক রূপ নিয়েছে। কাণ্ডজ্ঞানহীন বিরোধিতায় সর্বদা সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। টিকাকরণ তার ব্যতিক্রম নয়। টিকাকরণে সরকারি প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার বদলে অনেক রাজনৈতিক নেতা টিকাকরণের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন। টিকাকরণ করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কখনো কেউ বলেনি যে, টিকাকরণ হলেই আর কোভিড সংক্রমণ হবে না। এই নিয়ে ধ্বংসাত্মক রাজনীতির অপচেষ্টাকে রুখতে অযথা শক্তিব্যয় হয়েছে। এরপর আছে টিকাকরণের বিপুল খরচ। ইউরোপ, আমেরিকায়,

আমাদের দেশের জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে বলতে হয় যে এত বিপুল পরিমাণ ভরতুকি আর কোনো দেশকে দিতে হয়নি। এই সুবিশাল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা এবং তার সফল রূপায়ণ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

এমনকী এশিয়ার উন্নত দেশগুলির কোথাও নিখরচায় টিকা দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে শুধু যে ভর্তুকিতে টিকাকরণ প্রক্রিয়ার বিপুল কর্মযজ্ঞ সাধিত হচ্ছে তাই নয়, দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের এক বড়ো অংশকে নিখরচায় টিকা দেওয়া হচ্ছে। এই বিপুল ব্যয়ভার দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে বাধ্য। সরকারকে ধন্যবাদ যে, সরকার সেই ব্যয়ভার বহন করছে। পৃথিবীতে আর একটিও এমন দেশ নেই যেখানে এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হয়েছে— কোনো কমিউনিস্ট দেশ তো নয়ই! এটা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারত কিন্তু পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মায়ানমারের মতো ফ্রিতে বিদেশ থেকে টিকা উপহার পায়নি। ভারতে ব্যবহৃত টিকা আমাদের দেশের দুটি কোম্পানি তৈরি করেছে। এই টিকা বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে তারা আমাদের দেশের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারকে স্ফীত করেছে। ভারতের দুটি টিকাই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে যারা ভারত বিরোধিতায় মেতে উঠে চীনের টিকাকরণের প্রসঙ্গ তুলে সরকারের বিরোধিতা করে, তাদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি তথ্য জানানো যাক। পাঁচটি চীনা টিকা বাজারে আন্তর্জাতিক ছাড়পত্র পেয়েছে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সরকারি মালিকানার কোম্পানি sinopharm-এর coronavac। তাদের পাঁচটি টিকার কার্যকারিতা (efficiacy) ৫০% থেকে ৭০% এর আশেপাশে। আমাদের ভারতের দুটি টিকাই তুলনায় অনেক বেশি কার্যকারিতার মান্যতা পেয়েছে। সেজন্য চীনের টিকার তুলনায় ভারতের টিকার রপ্তানির রেকর্ড ভালো। এমনকী রাশিয়ার টিকা স্পুটনিকের তুলনায় ভারতের দুটি টিকার কার্যকারিতা অনেক

ভালো। রাশিয়া কিন্তু তার সব নাগরিককে নিখরচায় টিকা দেয়নি। চীনের স্থানীয় প্রশাসনগুলি প্রথমে বিভিন্ন রকম পরিষেবার ফি নিয়ে টিকাকরণ শুরু করেছিল। তারপর চীন সরকার পরবর্তী সময়ে এই টিকা বিনামূল্যে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। তারা বিনামূল্যে সরকারি sinopharm-এর টিকা দিচ্ছে। ভারত বা অন্যান্য দেশে সরকারি সংস্থায় এই টিকা তৈরি হয় না। তাই অন্য কোনো দেশ নিঃশুল্ক টিকাকরণ করতে পারে না। চীনের এই টিকার গবেষণা, উৎপাদন ও পরিবহণের খরচ সরকার দিলেও কোভিড সেসের মাধ্যমে চীন এই অর্থ জনসাধারণের থেকেই তুলেছে। এখানে আরেকটি কথা বলা দরকার। বাংলাদেশ, বাহারিন ও UAE প্রথমে চীনা টিকা আমদানি করলেও এর কার্যকারিতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী সন্দেহের বাতাবরণ এবং কর্মক্ষমতায় ঘাটতি থাকায় এই দেশগুলিও এখন ভারতীয়, আমেরিকান বা ইউরোপীয় টিকার দিকে ঝুঁকেছে। তুরস্ক, ব্রাজিল ও চিলি প্রথমে বরাত দিলেও এখন আর চীনা টিকা আমদানি করছে না। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ, চীনা টিকার গবেষণালব্ধ ফল প্রকাশের অস্বচ্ছতা এবং তার কার্যকারিতা কম হওয়া।

এত সব সত্ত্বেও চীন ও ভারত দুটি দেশই তার নাগরিকদের মধ্যে একশো কোটি মানুষকে টিকাকরণের আওতায় এনেছে। এর মধ্যে ভারতের শতকরা হিসেবে এবং টিকার কার্যকারিতায় আমরা অনেক এগিয়ে। একটা ছোটো ঘটনার উল্লেখ করছি। পাকিস্তানকে চীন ও ভারত উভয় দেশই মানবিক কারণে তাদের নিজেদের দেশে প্রস্তুত টিকা পাঠায়। এর মধ্যে ভারতে প্রস্তুত টিকার পুরোটা পাকিস্তান ব্যবহার করলেও চীনের পাঠানো টিকার পুরো কোটা তারা ব্যবহার করেনি। রাজনীতি অন্য ব্যাপার। কিন্তু এর থেকে এটা পরিস্কার যে টিকার বিশ্বাসযোগ্যতায় চীনা টিকাকে ভারতীয় টিকা ছাপিয়ে গেছে।

এবার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসা যাক। যেহেতু আমাদের দেশের নাগরিকদের ৭০ শতাংশের টিকাকরণ ২০২২ সালের প্রথমদিকেই সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে herd immunity তৈরি শুরু হয়েছে। এটা অত্যন্ত খুশির খবর। দেশের ক্রমহ্রাসমান আক্রান্তের সংখ্যা এই তথ্যকেই সমর্থন করে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। চীন আমাদের দুমাস আগে টিকাকরণ শুরু করেও ভারতের থেকে এগিয়ে থাকতে পারেনি। এর কৃতিত্ব সাধারণ নাগরিক, স্বাস্থ্যকর্মী, সরকারি প্রশাসন থেকে শুরু করে প্রশাসনিকস্তরের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণকারীদের উপর বর্তায়। রাজনৈতিক বিরোধিতা করার নামে টিকাকরণের বিরোধিতা কিন্তু দেশের মানুষের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার বিরোধিতা করা। কারণ, টিকাকরণের বিপুল কর্মযজ্ঞে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে স্থানীয় স্তর, সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতাতেই এই সাফল্য এসেছে। পরিকল্পনা ও তার সফল রূপায়ণের জন্য তাঁদের সকলের ধন্যবাদ প্রাপ্য।

অনেক রাজনৈতিক নেতা ও তাঁদের মন জুগিয়ে চলা সংবাদপত্র দাবি তুলেছিল যে সব নাগরিককে বিনামূল্যে টিকা দিতে হবে। এ কীভাবে সম্ভব? সরকারকে টিকা কিনতে হচ্ছে। তারপর টিকাকরণের আনুষঙ্গিক খরচ, পরিবহণের খরচ---এইসব সরকারকেই দিতে হবে। এই টাকা সরকারের কাছে আসবে কোথা থেকে? যে জন্য কোনো দেশই বিনামূল্যে সম্পূর্ণ টিকাকরণ করতে পারেনি। কিন্তু ভারত সরকার বেশ কিছু টিকা বিনামূল্যে দিয়েছে এবং যথারীতি সেই খরচের চাপ সরকারি কোষাগারের উপর পড়েছে। এটাই নিয়ম। চীনের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তারা 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'র মতো নীতিতে 'বিনা পয়সায় টিকা' দিয়েছে। তবুও বলব, আমাদের দেশে অত্যন্ত কম টাকায় টিকা দেওয়া হয়েছে। আমি প্রথম ডোজ ২৫০ টাকা ও দ্বিতীয় ডোজ ৭৮০ টাকার বিনিময়ে পেয়েছি। অথচ আমেরিকায় টিকার ন্যূনতম মূল্য ৬ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪৮০ টাকা, সঙ্গে টিকা দেওয়ার খরচ। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার টাকা। আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের সঠিক পরিকল্পনার সুফল আমরা পেয়েছি। যে দুটি সংস্থা আমাদের দেশে টিকা তৈরি করছে—কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন—ভারত সরকার তাদের বিভিন্ন সুবিধে দিয়ে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে ভরতুকিমূল্যে কিনে বিভিন্ন রাজ্যসরকারের মারফত সরবরাহ করায় এত সুলভ মূল্যে টিকা পাওয়া গেছে। আমাদের দেশের জনসংখ্যার কথা মাথায় রেখে বলতে হয় যে এত বিপুল পরিমাণ ভরতুকি আর কোনো দেশকে দিতে হয়নি। এই সুবিশাল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা এবং তার সফল রূপায়ণ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে।

পরিশেষে জানাই, এভাবে চললে আমরা দুবছরের (যা শুরুতে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে ন্যূনতম মনে হয়েছিল) অনেক কম সময়ে আমাদের দেশের কোভিড টিকাকরণ প্রক্রিয়া শেষ করতে পারব। □

With Best Compliments from :

A
WELL WISHER

বিজ্ঞান শিক্ষায় ঔপনিবেশিক দাসত্বের ইতিহাস

পিন্টু সান্যাল

দ্বিতীয় পর্ব

জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপরীত্যের পাশাপাশি আরব দুনিয়া ও খ্রিস্টীয় ইউরোপের মধ্যে সম্পদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। তাই ক্রুসেডকে শুধুমাত্র উপাসনা-পদ্ধতিগত (Religious) সংগ্রাম বললে ভুল বলা হবে। নিঃসন্দেহে ক্রুসেড একটি বিশেষ উপাসনা পদ্ধতির সমর্থনে তৈরি হওয়া উন্মাদনা কিন্তু এর পেছনে যারা ছিল তাদের লক্ষ্য কি শুধুই নিজস্ব উপাসনা-কেন্দ্রিক ছিল? আসলে সেই সময়ে ইউরোপের দারিদ্র্য আর আরবের ঐশ্বর্য ক্রুসেডের একটা কারণ অবশ্যই ছিল। যে কোনো রাজনৈতিক ঘটনার ফল, তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক দিশা দিতে পারে। ফল যাই হোক না কেন, প্রত্যেক ক্রুসেডের পরে চার্চের সম্পত্তি বেড়ে যেত। আরবীয় সাম্রাজ্যের সীমানায় খ্রিস্টীয় ইউরোপ যেন ধাক্কা দিচ্ছে সেসময়।

খিলাফত সাম্রাজ্য স্পেনের কর্ডোবাতে ধাক্কা পায়। ধীরে ধীরে কর্ডোবা খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করে এবং আরবীয় সাম্রাজ্যে গড়ে ওঠা টলেডো লাইব্রেরি ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানদের অধিকারভুক্ত হয়। ততদিনে খ্রিস্টীয় ইউরোপ বুঝতে পেরেছে সমৃদ্ধির জন্য বাইবেলের বাইরের জ্ঞান তাদের প্রয়োজন। এমনকী মুসলমান ছাত্রের ছদ্মবেশে একজন খ্রিস্টান গুপ্তচর (Adelard of Bath) জ্যামিতির সুপরিচিত গ্রন্থ Elements-কে আরবি থেকে ল্যাটিনে অনুবাদ করে। যদি বলা হয় আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়িয়ে খ্রিস্টীয় দুনিয়ায় অন্ধকার যুগ শুরু হয়েছিল, তাহলে অন্ধকার যুগের অবসান শুরু হয় ১১২৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে টলেডো লাইব্রেরির বইগুলোর ল্যাটিন ভাষায় ব্যাপক অনুবাদের মাধ্যমে।

খ্রিস্টীয় ইউরোপের 'অন্ধকার যুগ'-এর সময় যে ভুল হয়েছিল এবার আর তা করলো না ইউরোপ। ইসলামীয় আরবকে দেখে খ্রিস্টীয় ইউরোপ উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে উপাসনা পদ্ধতির সংকীর্ণতার বাইরে যে জ্ঞান-সমুদ্র, সেখানে তরী ভাসালেই সম্পদের উৎস পাওয়া যায়। তাই আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির মতো টলেডোর লাইব্রেরিকে পুড়তে হলো না।

শুধুমাত্র পার্থিব সমৃদ্ধির জন্যই চার্চ বাইবেল-বহির্ভূত জ্ঞানের খোঁজ করছিল না, চার্চের জ্ঞানের প্রয়োজন ছিল অন্য আর একটি কারণে। গ্রিক-রোমান সাম্রাজ্যে মূর্তি পূজকদের (Pagans) যেভাবে শক্তি প্রয়োগে উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্তন করানো গেছে, এখন শক্তিশালী আরবদের ক্ষেত্রে সেই একই পন্থায় কাজ হবে না। ইসলামীয় আরবের উপাসনা পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্যে দরকার বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে নিজেদের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করা। কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে চার্চের লড়াই সেই ইসলামীয় দুনিয়ায় আরবিতে লিখিত বইগুলোর জ্ঞান, চার্চ কেমন করে আপন করবে? এতে করে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে আরবীয়দের উৎকৃষ্টতাকে স্বীকৃতি দিতে হয়।

তাই শুরু হলো ইতিহাসকে বা বলা ভালো বিজ্ঞানের ইতিহাসকে নিজেদের সুবিধামতো বিকৃত করা।

কনস্ট্যানটাইনের খ্রিস্টের উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে চার্চ ও স্টেটের (রাজশক্তি) মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হয়েছিল। এই সময়েই চার্চের ঐতিহাসিক ইউসিবিয়াস (Eusebius) চার্চের স্বার্থে ইতিহাস বিকৃত করার কাজ শুরু করে। এর পরে ওরোসিয়াস (Orosius) নিজের

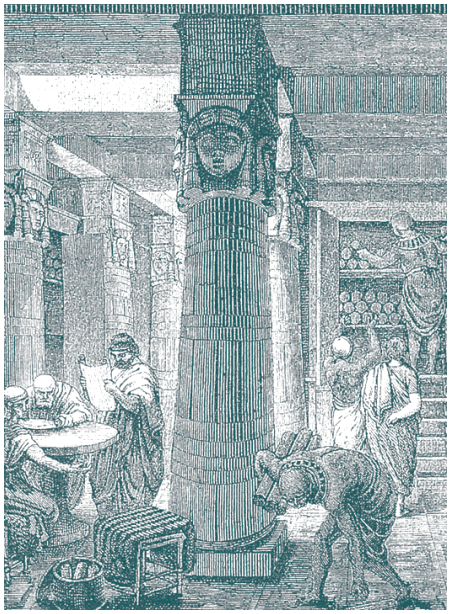

লেখা 'History Against the Pagans' বা বলা ভালো বিকৃত ইতিহাসের মাধ্যমে ইতিহাসকে চার্চের নতুন অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। বর্তমানেও আমরা দেখি সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেলকে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের পক্ষে জনমত তৈরিতে সক্রিয় হতে। সঠিক ইতিহাস লুকিয়ে রাখা বা ইতিহাসকে বিকৃত করার ঘটনাও আমাদের কাছে নতুন নয়। কিন্তু এটা ভেবে অবাক হতে হয় যে, এই অস্ত্রের সফল সুদূরপ্রসারী প্রয়োগ হাজার বছর আগেই শুরু হয়ে থাকলে বিগত ২০০০ বছরে কোনো একটি সভ্যতা-সংস্কৃতি, কোনো একটি মতাদর্শের বিলুপ্তি বা জাগরণ প্রকৃতিগত বা মানবসভ্যতার স্বাভাবিক প্রয়োজনে হয়নি, হয়েছে মানবনির্মিত এক অস্ত্রের প্রয়োগে যার নাম— 'ইতিহাস বিকৃতকরণ'। পারমাণবিক বোমার মতো প্রচণ্ড শব্দ-তাপে এই অস্ত্রের বিস্ফোরণ হয় না, এই অস্ত্র প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিঃশব্দে কাজ করে যায়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসকে বিকৃত করা শুরু হলো বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে নিজেদের উৎকৃষ্ট প্রমাণ করে খ্রিস্টীয় উপাসনা পদ্ধতির প্রসার করার জন্য। বলা হলো, ইউরোপের ৬০০ বছরের অন্ধকার যুগের সময় আরব শুধুমাত্র গ্রিকদের বিজ্ঞানকে সংরক্ষণ করেছে এবং সেই বিজ্ঞানের একমাত্র উত্তরাধিকারী খ্রিস্টীয় ইউরোপ। যে জ্ঞানকে ইউরোপ নিজের বলে দাবি করলো তার আসল উৎস, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্মদাতা শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সেই সমাজের জীবন পদ্ধতি জানার প্রয়োজনীয়তা ইউরোপ উপলব্ধি করেনি। সংকীর্ণতা ছেড়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বইয়ের অনুবাদ যেন ইউরোপের ঘুম ভাঙালো। □

মোদী বিরোধিতার ফাঁদে পা দিয়েছেন তথাকথিত কৃষক নেতারা। কারা কৃষক-দরদী আর কারা কৃষক-বিরোধী তা বোঝার শক্তিও হারিয়েছেন তারা।

গুরু নানকের জন্মদিনে ঘায়েল বিরোধীরা

বিশ্বপ্রিয় দাস

তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই তিনটি আইন লাভ হওয়ার পর দেশ জুড়ে কৃষক বিক্ষোভ শুরু হয়। এই তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ২০২০ সালের নভেম্বর থেকে পঞ্জাব ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আন্দোলন শুরু করেন কৃষকেরা। এরপর তারা দিল্লি পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলনের গতিকে ছড়িয়ে দেন। প্রসঙ্গত ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে যেদিন বিলটি পাশ হয়, সেই মুহূর্তে তুমুল হইচইয়ের সাক্ষী হয় রাজ্যসভা। পরে বিলটি পাশ হয়ে যায় এবং এই বিলটি পুরোপুরি ছিল দেশের কৃষকদের স্বার্থে ও নিরাপত্তায়। একদিকে যেমন ছিল উৎপাদিত সামগ্রীর উপযুক্ত দাম পাওয়া, কৃষি জমির ক্ষেত্রে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা, আর অবশ্যই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের সংশোধন। যেখানে বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে কালোবাজারি রোধে, মজুতদারি রোধে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

গুরুনানকের জন্মদিনে তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণে বলেন, ''হয়তো আমাদের তপস্যায় কিছুর অভাব ছিল, যে কারণে আমরা কৃষকদের এই আইন সম্পর্কে বোঝাতে পারিনি। তবে আজ প্রকাশ পর্ব, কাউকে দোষারোপ করার সময় নয়। আজ আমি দেশকে বলতে চাই যে আমরা তিনটি কৃষি আইন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি''।

প্রধানমন্ত্রীর এই সৎ সাহস এবং বিশেষ করে একটি দেশের পক্ষে, কৃষকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিলকে বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত তিনি প্রকাশ্য মাধ্যমে ঘোষণা করলেন, তাতে তাঁর ও তাঁর শাসন দক্ষতার একটা পরিচয় পাওয়া গেল। আর অবশ্যই তিনি বাহবা পাবেন এই কারণে যে বিলটি যাদের নিরাপত্তার আনা হচ্ছিল, আর আনা গেল না। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, কৃষকদের বৃহত্তর অংশের ক্ষেত্রে ক্ষতি বই ভালো হলো না।

যাই হোক এই তিন আইন বাতিলের ফলে কার, কী উপকার হবে, সেটা যাদের নিরাপত্তায় মোদী সরকার বিলটি আনতে চাইছিলেন, তারাই বুঝবেন ভবিষ্যতে। একটা প্রবাদ আছে, 'ঝড়ে বক মরে, আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে'। সবাই বলছেন তাঁদের আন্দোলনের ফলেই নাকি পিছু হটেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার। সে কংগ্রেস হোক বা আমাদের রাজ্যের তৃণমূল ও বামপন্থীরা। এই ফকিরেরা এটা হয়ত বুঝেও বুঝলেন না, বা না বোঝার ভান করে এড়িয়ে গেলেন, সেটা হলো, মোদীর মাস্টার স্ট্রোকে কুপোকাত হয়ে গেল, আর একেবারে ভোঁতা হয়ে গেল মোদী বিরোধিতার অস্ত্র।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, যে বিষয় নিয়ে আন্দোলন, সেই কৃষি বিল যখন শাসক দল প্রকাশ্যে, মিডিয়ার মারফত, দেশবাসীর কাছে প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী, তখন তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন তুলে আন্দোলন চালিয়ে যাবার যে রাস্তা টিকায়েতেরা নিলেন, তাতে একটা বিষয় হয়তো পরিষ্কার হয়ে গেল, তাঁদের আন্দোলন এই বিল-বিরোধী কতটা ছিল। এই আন্দোলন কৃষক দরদিরা কতটা ছিলেন? রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বর্তমানে টিকায়েতদের আন্দোলন চালিয়ে যাবার যে সিদ্ধান্ত, সেটো পুরোটাই দেশের

শাসক মোদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলন। যার পিছনে রয়েছে দেশের সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি। এখানে দাবার বোড়ে হয়েছিলেন কৃষকরা। মনে রাখতে হবে, যেদিন মোদী সরকার প্রথম ক্ষমতায় আসেন, সেই সময়ে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলা। ধীরে ধীরে নানাভাবে কৃষকদের সব দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাঁদের সরকারিভাবে সাহায্য করে, মহাজনদের জাল থেকে মুক্ত করা, নানা ট্রেনিঙের মাধ্যমে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, এরকম আরও অনেক কিছু। আর সেই পথ ধরেই এসেছিল এই বিল। কৃষক নিরাপত্তার হাতিয়ার। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বলার প্রয়োজন আছে। হয়তো অনেকেই এর প্রতিবাদ করবেন, তবুও বলতে দ্বিধা নেই, এর আগে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রধানমন্ত্রী এভাবে কৃষকদের জন্য ভাবেনি বা এভাবে ব্যবস্থা নেননি।

দেশের দীর্ঘদিন শাসন ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস বা অন্য দল কোনদিন কি ভেবেছিল কৃষকদের ব্যাঙ্কের হিসাব খাতে সরাসরি টাকা দেবার কথা? নামী কিষান ক্রেডিট কার্ডের বিষয়টিকে আরও মসৃণ করার? সে কথা বলতে গেলে একটা মহাভারত লেখা হয়ে যাবে। কৃষক গরিব থেকে আরও গরিব হয়েছিল। একটাও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি। আজ তারা মোদীর কাছে সরাসরি দাবি জানাতে পারে। ভায়া মিডিয়ার দরকার হয় না। কংগ্রেস আমলে বা অবিজেপি আমলে কৃষকদের স্থান ছিল স্থানীয় নেতাদের পায়ের তলায়। মোদীর আমলে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, উন্নয়নের কাজকে আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরাসরি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাজ, আর সেই কাজের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, সেগুলি সবই নেওয়া হয়েছে এই বিজেপি সরকারের সময়েই। অটলবিহারী বাজপেয়ী স্বপ্ন দেখেছিলেন যে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি সড়ক পথে যাতে দেশের এক কোনা থেকে আরেক কোনায় পৌঁছায়, সেই ব্যবস্থা করতে। ভারতের বুকে তৈরি হয়েছে ঐতিহাসিক সড়ক পথ সোনালি চতুর্ভুজ। এখন অনেক সস্তায় ও সহজে ক্ষুদ্র কৃষকরাও কৃষিজাত পণ্য দূরের বাজারে পাঠাতে পারছেন। আর কৃষিজাত পণ্যের দামও ভালোই পাচ্ছেন। নরেন্দ্র মোদী, অটলবিহারী বাজপেয়ীর দেখা সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছেন। আরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন পাইকারি ক্রেতারা যেমন সরাসরি বিক্রেতা কৃষকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন, তেমনি, কৃষকরাও চলে যাচ্ছেন তাঁদের কাছে। ফলে বিরোধীদের মুখে বলার কিছু আছে বলে মনে হয় না। কারা কৃষক দরদী, আর কারা কৃষক বিরোধী, সেটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। □

কী ছিল তিনটি বিলে—

১। ফারমার্স প্রোডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স (প্রোমোশন অ্যান্ড ফেসিলিটেশন) অ্যাক্ট, ২০২০। এখানে বলা হয়েছিল যে বড়ো ব্যবসায়ী বা বেসরকারি সংস্থা চাইলে সরাসরি চাষির কাছ থেকে কৃষিজ পণ্য কিনতে পারবে। এর পিছনে যুক্তি ছিল যে এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার সময়ে বাজারের সর্বোচ্চ মূলটি পাবেন।

২। ফারমার্স (এমপাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড প্রটেকশন) এগ্রিমেন্ট অব প্রাইস অ্যাসিওরান্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিসেস অ্যাক্ট, ২০২০। এই আইন অনুযায়ী কোনও বেসরকারি বাণিজ্য সংস্থা বা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থা চাইলে কৃষকদের কাছ থেকে জমি লিজ নিয়ে সেই জমিতে কৃষিজ পণ্য ফলাতে পারবে। এর পিছনে যুক্তি ছিল, এর ফলে দেশে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাবে। আর সেই কারণে উদ্‌বৃত্ত কৃষি পণ্য রফতানির পথ প্রশস্ত হয়ে, রপ্তানিও হবে।

৩। এসেনশিয়াল কমোডিটিজ (সংশোধিত) বা অত্যাবশ্যক পণ্য আইন। এই বিল অনুযায়ী চাল, ডাল, গম, ভোজ্য তেল, তৈলবীজ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী মজুতের উর্ধ্বসীমা বলে কিছু থাকবে না। এটি করার উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের নিরাপত্তা দেওয়া, আর ফড়েরাজ শেষ করা। এই আইনটি যদি হতো, তাহলে ফড়েদের দাপট শেষ হয়ে যেত। কৃষিক্ষেত্রে বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগ আসবার একটা সম্ভাবনাও সৃষ্টি হতো।

কৃষি আইন প্রত্যাহার একটি সময়োচিত সিদ্ধান্ত

দেশের কুড়িটি রাজ্যে চুক্তিচাষ আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। মোট তেইশটি রাজ্যে কৃষকদের থেকে সরাসরি ফসল কেনার ছাড়পত্র রয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের। সরকারি মান্ডি ছাড়াও বাইশটি রাজ্যে রয়েছে বেসরকারি মান্ডিও। তাছাড়া একুশটি রাজ্যে পুরোদমে কৃষিপণ্যের ই-ট্রেডিং হয়। বিভিন্ন রাজ্যের এইসব পদক্ষেপগুলি কোনোটাই কিন্তু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি।

সুজিত রায়

অপ্রত্যাশিত। কিন্তু বাস্তব এটাই, তিনটি নতুন কৃষি আইন স্বীকৃতি পাওয়ার ১৪ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আইনানুগ পদ্ধতিতেই ফিরিয়ে নিলেন তিনটি কৃষিবিলই। কারণ

কৃষিবিল প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিখুঁতভাবে রাজনীতির পাল্লায় মেপে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেননি— কৃষক বিক্ষোভ দেশদ্রোহ, কৃষকরা দেশদ্রোহী। অতএব হাতে ইস্যু নেই বিরোধীদের, যা তারা ভাঙিয়ে খেতে পারেন।

দিল্লির গা ঘেঁষা সিংঘু সীমান্তে, মূলত পঞ্জাবের কৃষকদের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এক তীব্র আন্দোলন।

কৃষিবিলগুলি প্রস্তাব আকারে পেশা করা হয়েছিল ২০২০-র ৫ জুন। ১৭ সেপ্টেম্বর বিলগুলি পাশ হয়ে যায় লোকসভায়। তীব্র বাদানুবাদের মধ্যেই তিনদিন পর ২০ সেপ্টেম্বর রাজ্যসভাতেও ধ্বনি ভোটে পাশ হয়ে যায় বিলগুলি এবং সেগুলি আইনে পরিণত হয়।

কিন্তু কৃষিবাজারের ফড়ে গোষ্ঠী এবং মূলত সম্পন্ন কৃষিপরিবারগুলি কিছু বিরোধী ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিলগুলির তীব্র বিরোধিতা শুরু করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল— এই আইনের সাহায্যে বাজারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়িক সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থা কৃষকদের জমিচ্যুত করবে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যগুলির দাম নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ঘুরপথে ব্যবসায়ীদের হাতেই চলে যাবে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ছিল— এই আইন কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবে। তাঁরা মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে আরও বেশি মাত্রায় শোষিত হবেন। ফলত পঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকেরা দিল্লি অভিযানের ডাক দিলেন ২৫ নভেম্বর। ৩ ডিসেম্বর সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনা হলেও সমাধানসূত্র মিলল না। ৮ ডিসেম্বর পালিত হলো ভারত বন্‌ধ। ৩১ ডিসেম্বর ভারতের কিষান ইউনিয়ন দ্বারস্থ হলো সুপ্রিম কোর্টের। ৪ জানুয়ারি বসল ফের বৈঠক। ব্যর্থ হলো বৈঠক। ১২ জানুয়ারি আইনগুলির ওপর স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২৬ জানুয়ারি ২০২১— সাধারণতন্ত্র দিবস থেকে শুরু হলো সরাসরি সংঘর্ষ। বিক্ষোভকারীরা ট্রাক্টর মিছিল করে ঢুকে পড়ল দিল্লি শহরের কেন্দ্রে। উগ্র বিরোধী শক্তি (সমালোচকদের মতে এদের মধ্যে মিশে ছিলেন খালিস্তানি উগ্রপন্থীরা) লালকেল্লার শীর্ষে জাতীয় পতাকার সম্মান না রেখে লাগিয়ে দিলেন নিশান সাহিবের পতাকা। ২৭ মে ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের নেতা রাকেশ টিকায়ত জানিয়ে দিলেন, দরকার হলে ২০২৪ সালে মোদী সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত চলবে আন্দোলন। এর মধ্যে সমাগত বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে চলেছে পুলিশ এবং শাসক দলের সংঘর্ষ। বিক্ষিপ্ত ভাবে মৃত্যুও হয়েছে কয়েকজনের। শেষ পর্যন্ত ১৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার আইনগুলি প্রত্যাহার করল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আইনগুলি প্রত্যাহার করে ঘোষণা করলেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল। কিন্তু কৃষি আইনের সুফলের কথা কিছু কৃষককে আমরা বোঝাতে পারিনি। হয়তো আমাদের তপস্যায় কিছুর অভাব ছিল। তবে কাউকে দোষারোপ করার সময় নয়। আজ আমি দেশকে বলতে চাই, আমাদের উদ্দেশ্যে কোনও শঠতা ছিল না।'

কিন্তু কেন এই সিদ্ধান্ত?

বর্তমানে দেশের ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জনই প্রান্তিক কৃষক। এঁদের জমির পরিমাণ ২ হেক্টরেরও কম। প্রায় ১০ কোটি এমন প্রান্তিক কৃষক রয়েছেন যাদের জীবন নির্ভর করে রয়েছে ছোটো ছোটো কৃষিজমির ওপর। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের স্বার্থে কৃষিবিমা যোজনাকে কার্যকর করেছে। অনেক বেশি সংখ্যক কৃষক বীমার আওতাধীন

হয়েছেন। চাষিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে কিষান সয়েল হেলথ কার্ড। এর ফলে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলন বেড়েছে। ছোটো কৃষকদের কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ ১ লক্ষ ৬২ হাজার কোটি টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে। কৃষকরা যাতে ন্যায্য মূল্য পান তার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। সরকারিভাবে কেনা কৃষিজাত পণ্যের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। রেকর্ড পরিমাণ ফসল কিনেছে সরকার। পাশাপাশি গ্রামীণ বাজারকেও শক্তিশালী করা হয়েছে। দেশের মান্ডিগুলিকে আধুনিক করার জন্য কেন্দ্র কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে। গত কয়েক দশকের চেয়ে অনেক বেশি অনুপাতে বেড়েছে কৃষি বাজেট। ছোটো সেচ প্রকল্প ফান্ডে আর্থিক অনুদান বাড়ানো হয়েছে দু' গুণ। পশুপালন এবং মৎস্য চাষের সঙ্গে যুক্ত কৃষকরাও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা পাচ্ছেন ইদানীং।

নতুন তিনটি কৃষি আইনও আনা হয়েছিল কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদী লাভের কথা ভেবেই। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর আক্ষেপ--- সরকার কৃষকদের তা বোঝাতে অক্ষম হয়েছে। কেন? কারণ, বাহ্যিক উস্কানি, মধ্যস্বত্বভোগীদের রাজনৈতিক কৌশল, বৃহৎ চাষি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের পেশিশক্তি এবং জঙ্গি রাজনীতির শরিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলে ছোটো চাষিরা সরকারি সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানাতে পারেনি। ঘটনা যাই হোক, এক ফাইভস্টার আন্দোলনের চেহারার উৎকট প্রদর্শন সাধারণভাবে মানুষের চোখে যতই দৃষ্টিকটু মনে হোক না কেন, মোদ্দা কথা হলো— কৃষকদের আন্দোলন জয়ী হয়েছে। তা আদতে কৃষক আন্দোলন হোক বা না হোক। সরকার পিছু হটেছে। তার মানে কি সরকার হেরে গেছে?

না, সরকারের এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে কিছু মানবিক চিন্তাভাবনা এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক কৌশলও। মানবিক চিন্তাভাবনাগুলি হলো— গায়ের জোরে মানুষের ওপর কিছু চাপিয়ে না দেওয়ার ভাবনা। সরকারি উদ্যোগ সাধারণভাবে কোনোসময়েই মানব-বিরোধী হয় না। এক্ষেত্রেও আইনগুলি সৎ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল কিন্তু কোনো কারণেই হোক না কেন, মানুষ যখন গ্রহণ করেনি, তখন কেন্দ্র আইনগুলিকে বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সরকার আশা করে, আগামীদিনে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা বুঝতে পারবেন, কৃষি আইন বর্জন করে আখেরে তাঁদের ক্ষতিই হয়েছে। লাভবান হয়েছেন মধ্যস্বত্বভোগীরাই। আর বিরোধী রাজনীতির কলাকুশলীরা।

এরপর পড়ে থাকে রাজনৈতিক দিক। নিঃসন্দেহ, রাজনৈতিক ভাবে কৃষি আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সমুচিতই নয়, সময়োচিতও বটে। কারণ ঠিক বা বেঠিক যাই হোক না কেন, কৃষি আইনগুলি ব্যাপকতর কৃষক বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। এই বিক্ষোভ অবশ্যই রাজনৈতিক। তাই এই বিক্ষোভের প্রতিকার করতে কেন্দ্রীয় সরকারকেও রাজনৈতিক আশ্রয়ই নিতে হয়েছে।

কারণ ২০২২ সালেই রয়েছে পঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন। বর্তমানে বিজেপি পঞ্জাবের নির্বাচনী সমীকরণে প্রায় কোণঠাসা। শিরোমণি অকালি দলও এনডিএ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওই তিনটি কৃষি আইনের বিরোধিতা করেই। যদিও একইসঙ্গে ভাঙন ধরেছে মূল প্রতিপক্ষ কংগ্রেস শিবিরেও। অতি সম্প্রতি প্রভাবশালী অমরিন্দর সিংহ কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে নতুন দল গড়েছেন এবং প্রায় নিশ্চিত যে তিনি এবং তাঁর দল এনডিএ-র সঙ্গেই যোগ দেবেন। এরকম একটা পরিস্থিতিতে কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ভাটার জলকে জোয়ারে পরিণত করতে সক্ষম হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। এবং তার প্রভাব পড়বে বাকি তিনটি রাজ্য— উত্তরাখণ্ড, মণিপুর ও গোয়ার বিধানসভা নির্বাচনেও। তবে নিঃসন্দেহে পঞ্জাবের কৃষক আন্দোলন ছিল সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। কৃষি আইন প্রত্যাহার করে কেন্দ্রীয় সরকার এক ঢিলে পাঁচ পাখিকেই ধরাশায়ী করার কৌশল নিয়েছে। যদিও পঞ্জাব ছাড়া বাকি কোনও রাজ্যেই বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে কেউ আঘাত হানতে পারবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে না। বিভিন্ন সমীক্ষক গোষ্ঠীর প্রাথমিক সমীক্ষাতেও সেরকমই ফলাফল উঠে এসেছে।

যদিও বিজেপি ঠিক এইভাবে বিষয়টিকে মেনে নেয়নি। মেনে না নেওয়ার পিছনেও যুক্তি আছে যথেষ্ট। কৃষি আইন প্রত্যাহারে কৃষিজগতের বিশাল কোনো লোকসান হবে না। কারণ ইতিমধ্যেই দেশের কুড়িটি রাজ্যে চুক্তিচাষ আইনি স্বীকৃতি পেয়েছে। মোট তেইশটি রাজ্যে কৃষকদের থেকে সরাসরি ফসল কেনার ছাড়পত্র রয়েছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের। সরকারি মান্ডি ছাড়াও বাইশটি রাজ্যে রয়েছে বেসরকারি মান্ডিও।

তাছাড়া একুশটি রাজ্যে পুরোদমে কৃষিপণ্যের ই-ট্রেডিং হয়। বিভিন্ন রাজ্যের এইসব পদক্ষেপগুলি কোনোটাই জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। কৃষকরা এই সব পদক্ষেপগুলির বিরোধিতাও করেননি কারণ তাদের আয় বাড়াতে এইসব পদক্ষেপগুলি সাহায্যই করে চলেছে। সুতরাং বিরোধীরা যে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভের পালে হাওয়া লাগাতে চেয়েছিলেন--- প্রধানমন্ত্রী কৃষিক্ষেত্রকে কর্পোরেট সেক্টরের হাতে তুলে দিতে চাইছেন, সেই অভিযোগকে নস্যাৎ করে দেয় বিভিন্ন রাজ্যের নয়া নীতিগত ও পরিচালনগত অবস্থান। আইনগুলি প্রত্যাহার করলেও লাভক্ষতির খতিয়ান যে সরকারের পক্ষেই থাকবে তা প্রধানমন্ত্রীর মতো তুখোড় রাজনীতিবিদ যে আগে বোঝেননি ভাবলে ভুল হবে। তিনি শুধুমাত্র অপেক্ষা করছিলেন সঠিক সময়ের যখন তাঁর কৌশলী অস্ত্রে ভোঁতা করে দেওয়া যাবে বিরোধীদের কৌশলকে। কোনও অর্থনৈতিক সমীক্ষকই অস্বীকার করতে পারবেন না, এই মুহূর্তে গত দেড় বছরের তুলনায় অনেক শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে এনডিএ সরকার।

এই মুহূর্তে বিরোধীদের হাতে বুড়ো আঙুল চোষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই যেমন কৃষকনেতা টিকায়েতজী আন্দোলন জারি রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন দাবি মিটে যাবার পরেও, তেমনি বিরোধী নেতারা সকলেই এক সুরে বলতে শুরু করেছেন— গোটাটাই নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক কৌশল। একবারও স্বীকার করছেন না, তাঁদের রাজনৈতিক কৌশলটা পরাস্ত হয়েছে। কত ধানে কতটা চাল হবে, কতটা গমে কতটা আটা হবে, তা নিখুঁতভাবে রাজনীতির পাল্লায় মেপে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেননি— কৃষক বিক্ষোভ দেশদ্রোহ, কৃষকরা দেশদ্রোহী। অতএব হাতে ইস্যু নেই বিরোধীদের, যা তারা ভাঙিয়ে খেতে পারেন। অতএব তাঁদের এখন সন্তুষ্ট থাকতে হবে হাতে পেনসিল নিয়েই।

নিরাপত্তার কারণে প্রত্যাহৃত কৃষিবিল

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি বিল প্রত্যাহারের মতো সিদ্ধান্ত কেন নিল? অনেকেই বলছেন আন্দোলন তো ঝিমিয়ে পড়ে ছিল তাহলে কেন এই সিদ্ধান্ত? বাস্তবসম্মত কারণ যা অনুমান করা হচ্ছে তা হলো—

১। কৃষি আইনগুলি আগেই আঠেরো মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল, ততদিনে ২০২৪ সালের নির্বাচন এসে যেত এই আইনগুলোর বাস্তবায়ন রাজনৈতিক ও আইনি জটে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে থাকা প্রায় নিশ্চিত ছিল, তাতে কারুরই কোনো উপকার হতো না। কাজেই সরকার আইনগুলি প্রত্যাহার করে এবং সম্ভবত তারা এই আইনগুলির খসড়ার উপর ভিত্তি করেই 'স্টেট স্পেসিফিক' কৃষি আইন আনবে। প্রগতিশীল ও ইচ্ছুক রাজ্যগুলি তাদের নিজস্ব কৃষি আইন আনবে ও কার্যকর করবে এবং বাকি রাজ্যগুলো স্থিতাবস্থায় থাকতে চাইলে থাকবে। এই পদ্ধতিতে অন্তত কয়েকটি বিরোধী রাজ্যের প্রতিবাদের কারণে সারা দেশে কৃষি সংস্কার আটকে থাকবে না।

(শ্রম আইনের ক্ষেত্রেও এই নীতিই গ্রহণ করা যেতে পারে; ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ক্ষেত্রে বিল প্রত্যাহার করে তা-ই করা হয়েছে)

২। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাজনিত সমস্যা আরেকটি কারণ হতে পারে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে পঞ্জাবে খালিস্তানি আন্দোলনের আকার নিচ্ছিল। ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহ এই ব্যাপারটা নিয়ে আগে বলেছেন। গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে বিদেশি শক্তি ভারতকে এক বৃহৎ হিংসাত্মক সংঘর্ষের দিকে নিয়ে চলেছে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের এক্তিয়ার ৫০ কিলোমিটার অবধি বিস্তৃত করার এটা অন্যতম কারণ হতে পারে। আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার সৈন্য চলে যাওয়ায় ভারত সবদিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমানা থাকা কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয় তালিবানদের মোকাবিলা করা। ভারত এক সর্বদেশীয় বৈঠক ডাকলেও চীন ও পাকিস্তান সাড়া দেয়নি। নিজেকে রক্ষা করার জন্য চীন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। মণিপুরে ভয়ংকর রকমের হামলা হয়েছে।

রাজা অ্যাকাডেমিকে অর্থ জোগায় চীন ও পাকিস্তান। সেই রাজা অ্যাকাডেমি মুম্বইয়ের গান্ধী ময়দানে হিংসাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। মালদ্বীপকে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানো হচ্ছিল। শ্রীলঙ্কার অবস্থা আর্থিকভাবে টলমল। বাংলাদেশে অশান্তি। মায়ানমারেও তাই। নেপাল ও ভুটানও চীনকে সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে।

কাশ্মীরে সাতজন জওয়ানকে জেহাদিরা হত্যা করে। হিন্দু বাসিন্দাদের কাশ্মীরে হত্যা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছিল। এনআইএ ৭ জন খালিস্তানি জঙ্গিকে পাকড়াও করেছে। ভুয়ো খবর ও গল্প ছড়িয়ে একটা গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছিল। খ্রিস্টান, মুসলমান ও খালিস্তানিরা হিন্দুদের পাশবিকভাবে হত্যা করত।

চীন ভারত আক্রমণ করলে আমেরিকা ভারতের পাশে দাঁড়াবে না, যেটা ট্রাম্প থাকলে হতো। বাইডেন প্রশাসন ও ডেমোক্র্যাটরা সর্বদা ভারত-বিদ্বেষী।

অজিত দোভাল জানিয়েছেন, সুশীল সমাজ অর্থাৎ শিক্ষিত ও তথাকথিত সেকুলার ভারতীয় যাদের দেশের অখণ্ডতা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই তারা অনেকেই বিদেশে সম্পত্তি করে রেখেছে, সেখানে তারা পালাবে। মোদী ভ্যাটিকানে গিয়ে পোপের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করলেন, কারণ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত ও কেরল জেহাদিদের স্বর্গরাজ্য। প্রথমে ভারত ও কেন্দ্রকে আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর তারা রাজ্যওয়ারি আক্রমণ শুরু করল। তারপর তারা সম্প্রদায় ধরে আক্রমণ হানতে শুরু করে, তাতেও ব্যর্থ হয়। ২৬ জানুয়ারি যারা লালকেল্লায় হানা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে যদি সরকার ব্যবস্থা নিত তাহলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হিংসার ঘটনা ঘটত, কারণ হিন্দুরা কৃষি বিল নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। সরকার অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচিয়েছে। আমাদের সামনে ২০২২ ও ২০২৪-এ কঠিন পরীক্ষা আসছে। তাই কৃষকদের বাঁচাতে কৃষিবিল আনা হয়েছিল আর দেশকে বাঁচাতে তা প্রত্যাহার করা হলো।

৩। সম্ভবত এটির একটি রাজনৈতিক দিকও রয়েছে, এই সিদ্ধান্ত পঞ্জাবে বিজেপি এবং ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহের নতুন দলের জোটের পথ প্রশস্ত করে। এতে অমরিন্দর সিংহের গোষ্ঠী ও অকালি দলও বিজেপির দিকে আসবে।

৪। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে জাঠ কৃষকরা ক্ষুব্ধ ছিল তারা শিখদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিল।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা দেশের নিরাপত্তার কথা ভেবেই মোদী সরকার কৃষিবিল প্রত্যাহার করেছে। □

আইবুড়ো ভাত রীতির নেপথ্যে

বিয়ের আগে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর রীতি আছে। প্রসঙ্গত জেনে নেওয়া যাক কিছু কথা। আইবুড়ো কথার সঠিক অর্থ খোঁজার চেষ্টা করা যাক। পণ্ডিত সমাজের মতে সংস্কৃত শব্দ 'অব্যূঢ়' বা 'আয়ুবৃদ্ধি' শব্দ থেকে 'আইবুড়ো' কথাটি এসেছে। 'অব্যূঢ়' শব্দের অর্থ অবিবাহিত। আবার 'আয়ুবৃদ্ধি' শব্দের অর্থ দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ। অর্থাৎ বুড়ো বয়েস পর্যন্ত আয়ু বৃদ্ধি হোক। এরূপ রীতি মাড়োয়ারি সমাজেও আছে। আমার ঠাকুমা আমাদের আশীর্বাদ করে বলতেন 'বুড্ডো ঢোকরো হোজা'। মানে বুড়ো বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকো। বিয়ে মানে এক নতুন জীবনে প্রবেশ। তাই ভালো ভালো খাওয়ানোর পর আত্মীয়স্বজন ও আপনজনেরা নতুন জীবনে প্রবেশের আগে আয়ুবৃদ্ধির আশীর্বাদ বা শুভ কামনা করেন। আয়ুবৃদ্ধি বা আয়ুবৃদ্ধ কথাটি কালক্রমে 'আইবড়' বা 'আইবুড়ো' হয়ে যাওয়াই সঙ্গত।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

জনতা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী ভাই দেশাই তাঁর স্বল্পকালীন জমানায় যে ব্যক্তিকে তাঁর শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন তিনি আর কেউ নন প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। বিশের দশকের শেষ দিক। বাড়িতে অতিথি এসেছেন। এর ফাঁকে ফর্সা সপ্রতিভ একটি শিশুকে দেখে অতিথি তাকে গান গাইতে অনুরোধ করলেন। শিশুটি গাইল রবীন্দ্রনাথের গান। বিস্মিত অতিথি বলেছিলেন, এ একদিন সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে। অতিথিটি জওহরলাল নেহরু, আর শিশুটি নির্মলচন্দ্র চন্দের পুত্র প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। ১৯৮৩ সালে ১ সেপ্টেম্বর তাঁর ৮৬ বছর পূর্ণ হয়। তিনি বলতেন আমি আর এমনকী। বরং প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠীরা, যেমন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি আবু সঈদ চৌধুরী, ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী, সত্যজিৎ রায় কিংবা সিদ্ধার্থশংকর রায়— এঁদের গৌরবেই তো আমি বেশি গর্ব অনুভব করি। বউবাজারের সেই স্মরণীয় বাড়ির একতলায় বইয়ে ঠাসা বসার ঘরে নীচু স্বরে কথাগুলি বলেছিলেন প্রবীণ এই মানুষটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও আইন, দুটি বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম প্রতাপবাবু সুদীর্ঘকাল আইনের অধ্যাপনা করেছেন বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। কয়েক বছর আগেই ইংরেজিতে অনুবাদ করেন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। পাঁচশোরও বেশি ছবি এঁকেছেন। রাজ্যের আইন ও অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই মানুষটির সান্নিধ্যে আসার। তিনি বারান্দায় সকালে ও বিকালে পায়চারি করতেন। শুনেছি তাঁর পিতা নির্মল চন্দ্র চন্দ্র ৭টি বিষয়ে স্বর্ণ পদক পেয়েছিলেন।

—বৈদ্যনাথ চন্দ্র,
বারুইপাড়া লেন, কলকাতা-৩৫।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম

ভারতবর্ষ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান। বিশ্বে প্রায় সকল ধর্মেরই প্রবর্তক আছে কিন্তু এই হিন্দুধর্মের কোনো প্রবর্তক নেই। ঋষিগণ প্রকৃতি থেকে এই ধর্মের সত্তা ও চালিকাশক্তিকে আহরণ করেছিলেন। তাই হিন্দু ধর্মের অন্য নাম সনাতন ধর্ম। এ ধর্মের মানুষের ন্যায়বোধ সহিষ্ণুতা মানবিক সম্পদ। এই বিশেষ গুণগুলি হিন্দু ধর্মের মানুষের মধ্যে এতো বেশি করে পরিলক্ষিত হয় কেন?

উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখতে পাবো প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি যেমন— বিশেষ করে বঙ্গদেশে রামায়ণ পালাগান, ভাসানযাত্রা পালাগান, হরিনাম সংকীর্তন, মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গীতা পাঠানুষ্ঠান ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশাসন মানুষ গ্রহণ করে থাকে। হিন্দু বা সনাতন ধর্মের মানুষ হিংস্র স্বভাবের না হওয়ার কারণ এরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপাসক। উদাহরণ স্বরূপ মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৯২নং শ্লোকের বর্ণনা তুলে ধরছি, ধৃতিঃক্ষমা দামোঽস্তেয়ং শৌচমিনিদ্রিয়নিগ্রহঃ ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধ দশকং ধর্মলক্ষণম্। ধৃতি হলো জগৎ সংসারের সাম্যক ধারাণা। ক্ষমা হলো মুক্তি দেওয়া। দমের অর্থ সংযম। অস্তেয় হলো চুরি না করা। শৌচ হলো পরিচ্ছন্নতা ইন্দ্রিয় সংযম মানে ইন্দ্রিয়কে জয় করা। ধী হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। বিদ্যা হলো অনুশীলন দ্বারা অর্জিত। সত্য-ন্যায় দর্শন দ্বারা অর্জিত। অক্রোধ-সহিষ্ণুতার দ্বারা অর্জিত।

সনাতন ধর্মের মানুষ চার মাতার পূজা করে থাকেন। গর্ভধারিণী মাতা, ভারতমাতা বা দেশ মাতা, গঙ্গামাতা ও গো মাতা। হিন্দু বা সনাতন ধর্মের আদর্শ সকল অসীম, অনন্ত, আনন্দ ও অমৃতের সন্ধান দেয় ও আস্বাদন করায়। কুসংস্কার মোচনে হিন্দুরা বরাবর এগিয়ে এসেছে। সতীদাহ মোচনে রাজা রামমোহন, বিধবা-বিবাহ প্রচলনে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভারত নারীদের মর্যাদা রক্ষায় ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে ভারত গগনে এই তিন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিন্দু বা সনাতন ধর্মকে অত্যুচ্চে তুলে ধরেছেন, প্রত্যেককেই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে।

আমার মনে হয়, এটা সম্ভব হয়েছে হিন্দু বা সনাতন ধর্মের কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম প্রবর্তক নেই বলেই। এই ভারতের বহুত্ববাদী অহিংস দর্শন সত্য সনাতন ক্ষয়িষ্ণু পথে চলছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ভারতের বৃহত্তর ইতিহাস। হিন্দুত্ব, ভারতীয়ত্ব, বহুত্ব স্বাধীনতা অর্জনে মুছে গেল কেন? ভারত স্বাধীনতার বিশ্বখ্যাত অহিংস দর্শনের সপ্রতিভ প্রতিভায় প্রতিভাত মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীজীর আফ্রিকা থেকে এসে স্বভূমে মুসলিম লিগের সহিংস ডাইরেক্ট অ্যাকশান স্বাধীনতার প্রাক্‌মুহূর্তে অহিংস দর্শনকে সমাধিস্থ করে দ্বিজাতি তত্ত্বে দেশ ভাগ। সে হিংসার অগ্নি আজও প্রজ্বলিত। তবে এ সত্য সনাতন অহিংস দর্শন মুছে যায় যদি, সর্বোচ্চ শিখরে উঠা মানব সভ্যতা থাকবে কি? 'অহিংস দর্শন যে সত্য-সনাতন' এ সত্য মুছে যাবে না কোনোদিন।

—রবীন্দ্রনাথ রায়,
শিয়ালদহ, রাশিডাঙ্গা, কোচবিহার।

কৃষি আইন দেশের পক্ষে এক জরুরি পদক্ষেপ ছিল

মন্দার গোস্বামী

তাহলে শেষ পর্যন্ত তিন কৃষি আইন রদ হলো। জয় হলো এমএসপি-র সিংহভাগ ক্ষীর খাওয়া সম্পন্ন কৃষকদের। জয় হলো সবজি মন্ডি নিয়ন্ত্রণকারী প্রবল প্রতাপশালী কৃষি ব্যবসায়ীদের। জয় হলো কৃষি ফড়েদের। পার্লামেন্টে তিন কৃষি আইন বাতিল এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অথচ বহুদিন ধরে এই আইনের প্রস্তুতি চলেছে, অসংখ্য কৃষক সংগঠনের মতামত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদের কথা অনুযায়ী ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ওয়েবিনার হয়েছে। ৯২ লক্ষ অন্নদাতা মতামত দিয়েছেন। সিংহভাগ কৃষক, অধিকাংশ কৃষিবিশেষজ্ঞ এই আইনকে সমর্থন করেছেন। তারপরই এসেছিল এই আইন। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এই আইনের প্রশংসা করেছে। এমনকী বাইডেন সরকারের আমেরিকাও এই সংস্কারকে সমর্থন জানিয়েছে। এমন তো নয় যে দেশের কৃষকরা শুধুমাত্র পঞ্জাব হরিয়ানা-সহ সিংঘু সীমান্তেই থাকে। অবশিষ্ট ভারতে কৃষক আন্দোলন কোথায় ছিল?

আসলে মান্ডিরাজের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী ধনী কৃষকদের একাধিপত্যে আঘাত হেনেছিল এই আইন। মূলত পঞ্জাব হরিয়ানার সম্পন্ন কৃষকরাই এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। এই আইন মান্ডিকে এড়িয়ে, কৃষক যেখানে বেশি দাম পাবেন, সেখানেই ফসল বিক্রি করবার অধিকার দিয়েছিল। তাই ভারতবর্ষের সামান্য কিছু অংশে, তুলনায় মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থান্বেষীদের বিক্ষোভ এই 'আন্দোলন'। এরাই কিছু লোক জুটিয়ে, কৃষকদের একাংশকে ভুল বুঝিয়ে সন্নিহিত এলাকার জনজীবন স্তব্ধ করে রেখেছিল, আজও রেখেছে। এরা কোনো আইন মানে না, সুপ্রিম কোর্টের কমিটিকে মানে না, আলোচনা করবার সদিচ্ছাও এদের নেই। অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত রাখাই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য। গত ২৬ জানুয়ারি পবিত্র গণতন্ত্র দিবসের

কৃষি বিল বাতিল হল। আগামী লক্ষ্য সম্ভবত সিএএ, এনআরসি, তারপর ৩৭০ ধারা— দুশ্চিন্তাটা থেকেই গেল।

দিন এদের গুন্ডামি সমগ্র দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। সঙ্গে জুটেছে কমিউনিস্ট প্রোৎসাহিত সেই ধ্বংসাত্মক টুকড়ে গ্যাং, যারা দেশের সংকটকালেও সদাসর্বদা দেশ বিরোধিতায় রাস্তায় নেমে পড়ে। আজ তারাও পড়শী ভাগ্যে পুত্র লাভের আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনাক্রম দেখে ভারতে প্রথম কম্পিউটার প্রবেশের সময়কাল মনে পড়ে যায়। তখনও একদল লোক বিশেষ করে তৎকালীন ক্ষমতাধর বামপন্থীরা প্রবল উৎসাহে কম্পিউটারের বিরোধিতা করে আন্দোলন, ভাঙচুর চালায়। কম্পিউটার এলে কারোরই কাজ থাকবে না, সবাই বেকার হয়ে যাবে, দারিদ্র্য বাড়বে, দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে ইত্যাদি হরেক কিসিমের অভিযোগ তুলে বামপন্থী অর্থনীতিবিদরা দেশবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে কম্পিউটার এলে দেশ নিশ্চিত রসাতলে যাবে। আজও সেই গণনাকারী 'কাক্কেশ্বর কুচকুচে'দের সুযোগ্য উত্তরসূরীরা একই কায়দায় কৃষি আইনের অপব্যাখ্যা চালিয়ে যাচ্ছেন।

অথচ কৃষিক্ষেত্রে অতি অবশ্যই সংস্কার প্রয়োজন। প্রয়োজন দেশের ৮৫ শতাংশ প্রকৃত কৃষকদের জীবনোন্নয়নের জন্যে যাঁরা মূলত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। প্রয়োজন দেশের অর্থনীতির উন্নয়নের স্বার্থে। ভারতীয় আয়কর অধিনিয়মের ১০ (১) ধারা অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্র থেকে রোজগারে আজও একটি পয়সাও আয়কর দিতে হয় না। ধনী সম্পন্ন তথাকথিত কৃষকরা চাষবাস থেকে কোটি কোটি টাকা আয় করলেও কৃষি ক্ষেত্রের আয় থেকে এক পয়সাও ইনকাম ট্যাক্স দেন না। বলিউড-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আজও কৃষি থেকে আয় দেখিয়ে যথাসম্ভব ট্যাক্স বাঁচান। তাই কৃষি সংস্কার ভারতবর্ষ অত্যন্ত জরুরি এক পদক্ষেপ ছিল।

আজ তথাকথিত কৃষি আন্দোলনের নামে ভারত বিরোধী শক্তি আবার সক্রিয় হয়েছে। কিছুদিন আগে এনআরসি, সিএএ বিরোধিতার অছিলায় যারা ভারতবর্ষকে অস্থির করে তুলেছিল, আজ তারাই আবার কৃষি আইনকে সামনে রেখে বিশ্ব দরবারে ভারতবর্ষকে কলঙ্কিত করবার অপচেষ্টা করে চলেছেন। কৃষি আইনকে শিখণ্ডী বানিয়ে যেভাবে পরিবেশ থেকে কোভিড-১৯ টিকাকরণ সবকিছু মিশিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেওয়া হচ্ছে, তাতে মনে আশঙ্কা জাগে। রেহানা, গ্রেটা থুনবার্গ, মিয়া খলিফারা সম্ভবত এই ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। 'মোদী প্ল্যানিং ফার্মার্স জেনোসাইড'-সহ অন্তত আরও আড়াইশো টুইটার হ্যান্ডল গালভরা নাম নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ভারত বিরোধী প্রচার করে চলেছে। স্বাধীন পঞ্জাবে 'খালিস্তান'-এর ওকালতকারী খালিস্তানিরা সক্রিয় হয়েছে। সক্রিয় হয়েছে ভারতেরই অভ্যন্তরের বিদেশি অর্থপুষ্ট ব্রেকিং ইন্ডিয়া গ্রুপ। আজ এরা রক্তের স্বাদ পেয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবু, আধুনিক ভোগবাদী জীবনের বিলাসী সামগ্রী, খাবার দাবার-সহ আরামদায়ক পরিকাঠামো সবই মজুত। তাই আগামী লক্ষ্য সম্ভবত সিএএ, এনআরসি, তারপর ৩৭০ ধারা— দুশ্চিন্তাটা থেকেই গেল।

পালংশাকের রকমারি

সুতপা বসাক ভড়

শীত এসে গেল। বাজারে নতুন সবজি উঠেছে। এগুলোর মধ্যে পালংশাক আমাদের অন্যতম প্রিয় একটি শাক। পালংশাক দিয়ে অনেকরকম ব্যঞ্জন হয় এবং সেগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত অথচ অতি উপাদেয় কিছু রান্নার চেষ্টা করা যেতে পারে; যেমন— পালংশাকের কচুরি, নিরামিষ পালংকোপ্তা, পালং পনির, পালং মুরগি। এই প্রতিটি রান্নার জন্য প্রথমে আমরা পালংশাক ভালো করে বেছে, ধুয়ে মিক্সিতে বা শিলনোড়াতে কাঁচালঙ্কা, আদা দিয়ে হালকা করে পিষে নেব।

পালংশাকের কচুরি : প্রথমে পরিমাণমতো আটা নুন সামান্য ঘি দিয়ে মেখে নেব। এরপর আটার মাপের মোটামুটি এক-চতুর্থাংশ পেষা পালংশাক দিয়ে আটা মাখব। জলের পরিবর্তে পেষা পালংশাক ব্যবহার করব। একটু শক্ত করে মেখে দশ মিনিট মতো ঢেকে রেখে দিতে হবে। এরপর সাধারণ লুচির মতো ভেজে নিতে হবে। অসাধারণ খেতে লাগবে পালংশাকের কচুরি।

নিরামিষ পালংকোপ্তা : কচি লাউ ঝিরি-ঝিরি করে কেটে নুন-হলুদ মাখিয়ে দশ মিনিট রেখে দিতে হবে। প্রচুর জল বেরোবে। হাত দিয়ে চিপে নেব। ওর মধ্যে নুন-আদা-রসুন-কাঁচালঙ্কাবাটা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে বেসন দিয়ে বড়ার মতো ভেজে নেব। কোপ্তা তৈরি। এবার কড়াইতে তেলে শুকনো লঙ্কা-মেথি ও তেজপাতা ফোড়ন দিতে হবে। এর মধ্যে ছোটো করে কাটা টম্যাটো, আদা, কাঁচালঙ্কাবাটা, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে, নেড়ে-চেড়ে পালংশাক বাটা দিতে হবে। পাঁচ মিনিট মতো কম আঁচে ফুটিয়ে কোপ্তা দিয়ে আরও দু-তিন মিনিট মতো কম আঁচে সামান্য মিষ্টি দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে আঁচ থেকে সরিয়ে নেব। পাঁচ মিনিট পরে ঢাকনা খুললেই তৈরি নিরামিষ পালং কোপ্তা।

পালং পনির : প্রথমে পনির নিজের পছন্দমতো আকারে কেটে হালকা ভেজে তুলে নিতে হবে। বাকি তেলে জিরে, কাঁচালঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে, ছোটো করে কাটা টম্যাটো, আদা, নুন, কাঁচা লঙ্কাকাটা মিশিয়ে নেড়ে নেব। পেষা পালংশাক মিশিয়ে আরও মিনিট পাঁচেক কম আঁচে ফুটিয়ে এর মধ্যে ভাজা পনিরের টুকরোগুলো মিশিয়ে আরও দু-মিনিট ফুটিয়ে আঁচ থেকে সরিয়ে নেব। এবার ওপর থেকে একচামচ ঘি ছড়িয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রাখব। পাঁচ মিনিট পর তৈরি পালং পনির।

পালং মুরগি : প্রথমে কড়াইতে তেলে সামান্য পেঁয়াজ ভেজে তার মধ্যে টোম্যাটো, আদা, রসুন, কাঁচালঙ্কা বাটা মেশাতে হবে। হালকা আঁচে নেড়েচেড়ে যখন মশলা থেকে তেল বেরোতে শুরু করবে তখন মাংসের টুকরো, সামান্য দই ও পাতিলেবুর রস ভালো করে মিশিয়ে দেব। নুনও দেব। মাংস একটু নরম হলে কড়াইতে ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা, পালংশাক পেষা দিয়ে আরও পাঁচ-সাত মিনিট রান্না করব। মাংস সুসিদ্ধ হলে সামান্য মিষ্টি দিয়ে আঁচ থেকে সরিয়ে আরও পাঁচমিনিট ঢাকা দিয়ে রাখব। রান্না শেষ।

কচুরি ছাড়া এরকম প্রত্যেকটি রান্না আমরা কম আঁচে করব। খুবই পুষ্টিকর, ঘরোয়া সুস্বাদু রান্নাগুলো যে কোনো দিন, খুব অল্প সময়ে বানানো যেতে পারে। এগুলি বাজারজাত যে কোনো রান্নার থেকে অনেক বেশি উপাদেয় ও পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। বিদেশি রান্নার থেকে সবদিক থেকে উৎকৃষ্ট এই দেশীয় রান্নাগুলি মূলত উত্তর ভারতের। তবে আমরাও খুব সহজে, অল্প সময়ে আমাদের প্রিয়জনদের জন্য এগুলো বানিয়ে ফেলতে পারি। ব্যবহৃত মশলা বেশিরভাগ বাড়ির রান্নাঘরে থাকে। এই শীতে আমরা মহিলারা একটু ভিন্ন স্বাদের রান্নায়, আন্তরিকতার সংমিশ্রণে সৃষ্টি করি আমাদের নিজস্ব পালংশাকের রকমারি! ▯

খাদ্যপুষ্টি জোগাতে তুলসীর বীজ

কৌশিক রায়

হিন্দু ঘরের সমস্ত ধর্মাচরণেই, শ্রাদ্ধ শান্তি, স্বস্ত্যয়নে অপরিহার্য তুলসীগাছ বিশেষ করে এই ছোটো গাছটির পাতা আমাদের জীবনের বহু ক্ষেত্রেই বেশ গভীর প্রভাব ফেলেছে। এই তুলসী গাছ বা 'বেসিল' যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হলো 'ওসিমাম স্যাংটাম'। করোনার অন্যতম উপসর্গ— সর্দি, কাশি ও গলাব্যথা সারাতে তুলসীপাতা মেশানো জলে গার্গল করতে এবং তুলসীপাতা চিবোতে নিদান দিয়েছেন অনেক চিকিৎসা বিশারদই। তবে, খাদ্যপুষ্টির দিক দিয়ে তুলসীগাছের বীজ, বা 'সাব্জা'-ও যে কম যায় না— সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন ডাক্তাররা।

বেঙ্গালুরুতে 'পৌস্টিক বেক্স্' নামক একটি খাদ্য প্রস্তুত এবং সরবরাহকারী সংস্থা চালাচ্ছেন পুষ্টিবিশারদ রেণুকা ভার্মা। তিনি জানিয়েছেন— ১০০ গ্রাম তুলসী বীজ থেকে দুটি ডিম এবং প্রায় আড়াইশো গ্রাম মাংসের সমতুল্য প্রোটিন পাওয়া যায়। গোটা পৃথিবীজুড়ে প্রায় ১৫০টি প্রজাতির মতো তুলসীগাছ পাওয়া যায়। তবে, আশ্চর্যজনকভাবে আফ্রিকার ক্রান্তীয় বা নিরক্ষীয় অরণ্যাঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া যায় তুলসীগাছ। দেখা গেছে— খাদ্যপুষ্টি জোগাতে 'বাবুই তুলসী' (Ocimum basilicum) গাছের বীজ যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে। কেক ও চাপাটি তৈরিতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বর্তমানে এই প্রজাতির তুলসীগাছের বীজ ব্যবহৃত হচ্ছে। এই তুলসীগাছের বীজগুলি কালো রঙের হয়। স্থানীয় মানুষরা বীজগুলিকে 'ফালুদা' বলেও ডাকেন। জলে ভিজিয়ে রাখলে এই তুলসী বীজগুলি থেকে মিউকাসের মতো বা জিলেটিনের মতো একধরনের রস বেরোতে শুরু করে। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন— অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারীর শাঁসের থেকেও আমাদের শরীরকে সুরক্ষা দিতে আরও বেশি কার্যকরী এই তুলসীবীজ। এর মিউকাস জাতীয় ক্ষরণে যথেষ্ট তন্তু বা ডায়েটারি ফাইবার আছে। এই ফাইবার দুটির নাম হলো 'গ্লুকোম্যানান' ও 'জাইলান' (Xylan)। এই রসটি মধুমেহ বা ডায়াবেটিস রোগ, অম্বল ও কোষ্ঠবদ্ধতাকে নিয়ন্ত্রণ করে সারিয়ে তোলে।

তুলসীগাছের এই বীজগুলির কোনও কড়া বা বিশেষ স্বাদ-গন্ধ নেই। তাই, রান্নার উপকরণ হিসেবে যে কোনও খাবারে এই বীজকে জলে ভিজিয়ে মেশানো চলে। ফলের রস ও মিল্কশেকের সঙ্গেও এই বীজকে মিশিয়ে পান করা যায়। কোরিয়ার সিওল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিজ্ঞানীরা এই তুলসীগাছের বীজকে চর্বি জাতীয় খাদ্যের অন্যতম বিকল্প হিসেবে দেখছেন। এই বীজ স্থূলত্ব বা ওবেসিটি রোগের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করতে পারে। দাক্ষিণাত্যের অন্যতম খাবার— ইডলিতে তুলসী বীজ মিশিয়ে স্বাস্থ্যকর খাদ্য তৈরিতে ভালো ফল পেয়েছেন তামিলনাড়ুর সালেমে অবস্থিত পেরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্যবিধি ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরা।

দেখা গেছে, পুষ্টিকর বরফি সন্দেশ তৈরি করতে এই তুলসী বীজের গুঁড়ো ময়দার মতো ব্যবহার করা যায়। এর সঙ্গে মেশানো যায় কালোমরিচ (Piper nigran), আখরোট, ছোলার ছাতু, চিনি আর খোয়া ক্ষীর। প্রতিদিন সকালে এই 'তুলসী-মিষ্টি', দুধ দিয়ে খেলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ কিছুটা বাড়বেই।

তুলসীগাছের বৃদ্ধিতে বেশি জলেরও প্রয়োজন হয় না। সুতরাং, খরাপীড়িত এলাকাতেও তুলসীর ফলন হয় ভালোই। তুলসীর বীজ থেকে তেলও পাওয়া যায়। এই তেলের জীবাণুনাশক ক্ষমতা রয়েছে। আমাদের ত্বকে ছত্রাক ও ইস্টের বিভিন্ন সংক্রমণ রোধ করে এই তুলসী বীজতেল। বিশেষ করে, আমাদের পায়ের আঙুলের ফাঁকে হাজা ও 'অ্যথলেট'স ফুট' নামক ছত্রাক— 'ক্যনডিডা অ্যালবিকান্স্ ট্রাইকোফাইটন মেন্টাগ্রোফাইটিস'-এর সংক্রমণ রোধ করে এই তেল। সম্প্রতি সংকরায়নের (Hybridisation) মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে সেন্ট্রাল ইন্স্টিটিউট অব মেডিসিন্যাল অ্যান্ড অ্যারোম্যাটিক প্ল্যান্টের বিজ্ঞানীরা পান, ল্যাভেন্ডার, এলাচ, কর্পূর ও লেবুর স্বাদ-গন্ধ বিশিষ্ট কয়েকটি তুলসী প্রজাতি তৈরি করেছেন।

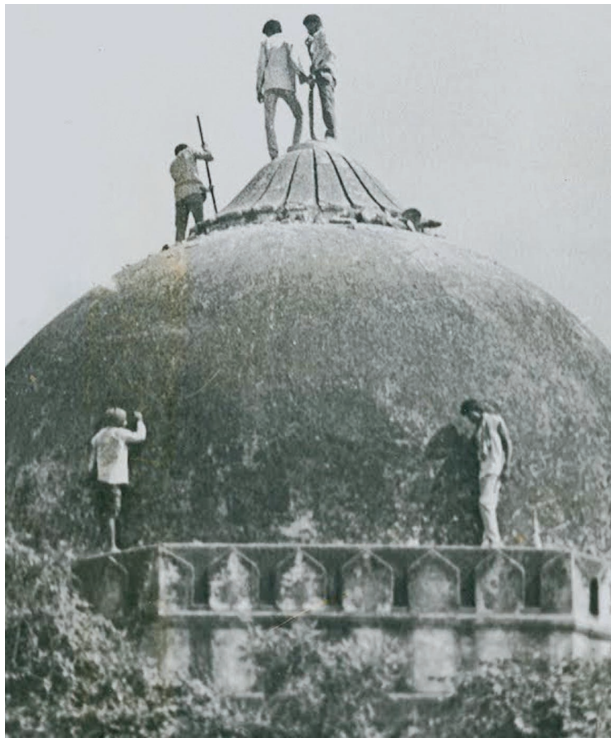

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর— জনরোষে ধূলিসাৎ হলো বাবরি ধাঁচা।

ভারতের আরাধ্য পুরুষের কারামুক্তির দিন ৬ ডিসেম্বর

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখ ভারতের ইতিহাসে এক মাইলফলক। বিদেশি India থেকে স্বদেশী 'ভারত'-এ ফেরার দিন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে বর্বর আরব দস্যুদের হানায় ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি, মঠ-মন্দির, মাতা-ভগিনীর ওপর যে অসহনীয় অত্যাচার ও ধ্বংসলীলা শুরু হয়েছে তার নিরবচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছিল ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত। এই কালখণ্ডে বাঙ্গলার প্রাচীন দেবালয় (মালদহ জেলার প্রাচীন মন্দির অধুনা আদিনা মসজিদ প্রভৃতি) সহ সারা ভারতের প্রায় ৩০ হাজার হিন্দু ধর্মস্থান মসজিদে-দরগায়-মাজারে রূপান্তরিত হয়েছিল। জগদ্‌বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দা, তক্ষশীলা, বিক্রমশীলা, বল্লভী প্রভৃতি ধ্বংস করে, তার বিপুল পুস্তকভাণ্ডার আগুনে পুড়িয়ে সেই বিধর্মীর দল এদেশের হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতিকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল। ৭১২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৭৫৭ এই এক হাজার পঁয়তাল্লিশ বছরের ইসলামি যুগ ছিল এদেশে এক দুর্বিষহ বিভীষিকার কাল।

তারপর এল ইংরেজ। ইংরেজরা ১৯০ বছরের দীর্ঘ শাসনকালে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে এদেশের ধর্মসংস্কৃতিকে নষ্ট করে সকলকে খ্রিস্টধর্মে সুকৌশলে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা করেছিল ঠিকই কিন্তু সফল হল না। হিন্দুধর্ম শেষ হলো না। মুসলমান ও খ্রিস্টান শাসনের এই ১২৩৫ বছরের চরম দুর্দিনে হিন্দু সমাজ কচ্ছপের মতো নিজের শরীরকে খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে সুদিনের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগল। ওপর থেকে মনে হচ্ছিল যে মৃত, নিঃশেষিত— কিন্তু বাস্তবে সে ছিল মৃত্যুহীন, অক্ষয়।

তারপর ধীরে ধীরে জেগে উঠল এদেশ। বহু বীরের বহু সংগ্রামে বহু রক্ত ঝরিয়ে অবশেষে ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পেলাম। ১২৩৫ বছর ধরে বিদেশি শাসনে থাকা প্রজন্মের পর প্রজন্ম নতুন করে আত্মপরিচয় জানতে সচেষ্ট হলো। এ জানা কোনো দেশ বিভাজনকারী, সিংহাসনলোভী, পরস্ত্রীর রূপে মুগ্ধ পণ্ডিতের 'Discovery of India' নয়—এত বছর পর মায়ের ছেলেরা মায়ের ঠিকুজি-কোষ্ঠী নিয়ে বসল এদেশের প্রকৃত শিকড়—'Identity of India'-র খোঁজে। শুরু হলো ভারত মন্থন। উঠে এল অমৃত নির্যাস। তারা বুঝল হাজার হাজার বছরের প্রবহমান সনাতন সংস্কৃতিই হলো এদেশের মূল পরিচয়---স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ''প্রত্যেক জাতিরই স্বকার্য সাধনের একটি বিশেষ প্রণালী আছে। ....ধর্মই আমাদের জাতীয় সংগীতের মূল সুর। অন্যসব কিছুই ধর্মের অধীন কিংবা রকমফের। এখন বুঝতে পারছো তো, এ রাক্ষসীর প্রাণপাখিটি কোথায়? ধর্মে, সেইটি নাশ কেউ করতে পারেনি বলেই জাতটা এত সয়ে এখনও বেঁচে আছে।'' আত্ম উপলব্ধি হলো আমাদের। এ দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন ভগবান শিব, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখ দেবতা ও অবতারেরা—যারা এই মাটিতে জন্মেছেন, হেসে খেলে লীলা করে বেরিয়েছেন।

এবার শুরু হলো শেকড়ে ফেরার তোড়জোড়। কিন্তু হাজার বছরের মুসলমান শাসনে, এদেশের আস্থাস্থল মহাপুরুষদের জন্মস্থানগুলি যে আজ চরম কলুষিত। ওই নরাধম পশুরা সেগুলিকে শুধু অপবিত্রই করেনি, সেইস্থানে তৈরি অন্য মন্দিরগুলি ভেঙে তার স্থানে তৈরি করেছে সুউচ্চ

মসজিদ—ইসলামি ঔদ্ধত্য ও হিন্দু জাতির অপমানের কলঙ্কচিহ্ন, যা এত যুগ ধরে আমাদের প্রতিনিয়ত বেদনা দিয়ে চলেছে। মনে প্রশ্ন, তবে কি স্বাধীন দেশে বিদেশি অপমানের এই বোঝা বয়ে বেড়ানো উচিত? দেশ কি তার আত্মপরিচয় ভুলে যাবে? ভুলে যাবে তার প্রণম্য মহাপুরুষদের?

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোনো পুত্রই দেশমায়ের এই অপমান সইতে পারে না। তাই সে তার পূর্বপুরুষদের ধর্মস্থান ফিরে পেতে প্রয়াস শুরু করল। ভগবান শিবের ভব্য সোমনাথ মন্দির—যা ১০০১ থেকে ১০২৫ সাল পর্যন্ত যাযাবর দস্যু মামুদ ১৭ বার লুঠ করে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল, অযোধ্যায় শ্রীরামের জন্মস্থানে নির্মিত শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির---যা অক্রমণকারী বাবর ১৫২৮ সালে ভেঙে তার উপর নিজের নামাঙ্কিত মসজিদ তৈরি করেছিল, বাবা ভোলানাথের লীলাক্ষেত্র কাশী বিশ্বনাথ মন্দির— যেটি ঔরঙ্গজেব ১৬৬৯ সালে ধ্বংস করে জ্ঞানবাপী মসজিদে রূপান্তরিত করেছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরা---যার ওপর ছিল এক বিশ্ববন্দিত কৃষ্ণ মন্দির—যে মন্দির ১৬৭০ সালে সিকান্দর লোদী ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে তার ওপর নির্মাণ করেছে ইসলামি দম্ভের সৌধ—সবগুলি হিন্দু সমাজ ফিরে পাওয়ার উদ্যোগ শুরু করল।

সদ্য স্বাধীন সরকারের কাছে হিন্দু সমাজের প্রত্যাশাও ছিল বিপুল। হিন্দুদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—এখন দেশে মুসলমান শাসন নেই, নেই ব্রিটিশ শাসনও—এবার নিশ্চই ভারতের আত্মপরিচয় ও স্ব-গৌরবের প্রতীক এই ধর্মস্থানগুলি সরকারি প্রচেষ্টায় মুক্ত হবে। কিন্তু না, দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী আদতে ছিলেন একজন কালো চামড়ার ইংরেজ। যিনি নিজেকে বলতেন "I am an English by education, a Muslim by culture, just a Hindu by accident." তাই তাঁর শাসনকালে এ স্বপ্ন কীভাবে বাস্তবায়িত হবে?

তবু তাঁর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বহু কষ্টে যদিও-বা সোমনাথের মন্দির পুনর্নির্মাণে সফল হলেন কিন্তু বাকিগুলি রইল অধরা। বাধ্য হয়ে হিন্দু সমাজ জন আন্দোলনের মাধ্যমে অযোধ্য-কাশী-মথুরা হিন্দুদের এই তিন প্রধান পবিত্রস্থান বিদেশিদের দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নিল। নেতৃত্ব দিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। মরা গাঙে বান এল। হাজার বছরের নিদ্রা ভেঙে হিন্দু সমাজ জেগে উঠল। প্রথমেই শ্রীরাম চন্দ্রের

জন্মস্থান থেকে বাবরি ধাঁচা সরিয়ে 'রাম জন্মভূমি মন্দির' নির্মাণের সংকল্প নিল তারা।

শুরু হলো জনজাগরণ। একাত্মতা রথযাত্রা, রামরথ পরিক্রমা, রামশিলাপূজন,

অযোধ্যা মামলার রায়ে দেশজুড়ে খুশির জোয়ার।

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের দাবিতে এল কে আদবানির নেতৃত্বে সোমনাথ থেকে রথযাত্রা। সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী।

শ্রীরাম-পাদুকা পূজন, শ্রীরামজ্যোতি যাত্রা, করসেবা—কিন্তু এত লড়াই করেও, হাজার রামভক্তের জীবনাহুতির পরেও এদেশের সরকার-আদালত-রাজনৈতিক দল কারোরই চেতনা ফিরল না। অবশেষে এদের এই নির্লিপ্ততায় ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত হিন্দু সমাজ ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বিদেশি অত্যাচারের কলঙ্কচিহ্ন 'বাবরি ধাঁচা' করল ধূলিসাৎ। তারপর কত প্রমাণ-দলিল-আইন-আদালত দোরে দোরে ঠোক্কর খাওয়া বুঝিয়ে দিল রামের দেশে রামই অসহায়। বাঁশ ও ত্রিপলের অস্থায়ী তাঁবুতে উদ্বাস্তুর মতো কোনো মতে মাথা গুঁজে থাকা—কেটেছে সে এক নরক যন্ত্রণা। অবশেষে দীর্ঘ ২৮ বছরের জো-হুজুর জো-হুজুরের শেষে আদালতের বুঝি দয়া হলো। আদেশ এল—প্রমাণ মিলেছে, এটাই রামের জন্মস্থান, রাম ফিরে পাক তার নিজের ঘর, হোক রামজন্মভূমি মন্দির।

কিন্তু কেন? কেন এই সুদীর্ঘ অপেক্ষা? এদেশের হিন্দু মানসে এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন! যে দেশের সব কিছুই রামময়, যে দেশের গ্রাম-শহর, পথ-ঘাট, মঠ-মন্দির সব রামের নামে সে দেশে রামের এত অমর্যাদা অবহেলা কেন? যে দেশে শিশু জন্মালে পিতা-মাতা তার নামে রাখেন কাশীরাম, রামমোহন, রামকুমার, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, শিবরাম---আবার কারো-বা রামতীর্থ, রামানুজম, রামস্বামী, রামস্বরূপ, রামনাথ—সে দেশে রামের এত দুর্দশা কেন? প্রশ্ন আসাই স্বাভাবিক। তবে এর উত্তর অনেক গভীরে।

১০৪৫ বছরের ইসলামি পরাধীনতার কালে মুসলমানেরা এদেশে কেবলমাত্র রামের মন্দিরটুকু ভাঙতেই সমর্থ হয়েছিল মাত্র। হিন্দুর অন্তরে রামের প্রতি যে আস্থা ও শ্রদ্ধা তাকে কখনও টলাতে পারেনি। কিন্তু পরের ১৯০ বছর ব্রিটিশ শাসনকালে চতুর ইংরেজ সুকৌশলে হিন্দুর হৃদয়ে তার আরাধ্য দেবতা ভগবান রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রণম্য পূর্বপুরুষদের প্রতি চরম অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা তৈরি করে দিতে অনেকাংশে সফল হয়েছিল।

তাইতো আধুনিক কালে এদেশের পিতা-মাতা যখন সন্তানের নাম রাখেন রামের নামে—তখন সে ছেলেই একটু বড় হয়ে দু-চার পাতা ইংরেজি পড়ে আদর্শভ্রষ্ট হয়। পরিচিত হয় কখনও ভ্রান্ত রাজনীতিবিদ সীতারাম ইয়েচুরি, আবার কখনওবা রামচন্দ্র গুহ'র মতো ভণ্ড ইতিহাসবিদ্ রূপে—যারা বলেন রাম বলে এদেশে কখনই কেউ ছিল না। ওটা একটা মিথ, কল্প চরিত্র মাত্র। পিতা চেয়েছিলেন পুত্র হোক রামের মতো ধার্মিক, চরিত্রবান, লোকসেবক, স্বদেশপ্রেমী কিন্তু পুত্র হলো হিন্দু ধর্মকে আফিম্ বলে ঘৃণা করা— রামচন্দ্রকে, কৃষ্ণকে গালি দেওয়া, এদেশের প্রতি শ্রদ্ধাহীন এক কুলাঙ্গার রূপে, যারা তার নিজের বাপ দাদা চোদ্দপুরুষকেও অস্বীকার করে। কিন্তু এত কিছুর পরেও ভগবান রামকে এদেশের মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যায়নি। এদেশের কুলাঙ্গারদের রাম বিরোধিতা যত বেড়েছে তার বিপরীতে অনেক বেশি সংহত হয়েছে রামভক্তদের শক্তি ও ভক্তি। এর পেছনে রয়েছে দেশের মনীষীদের দেশ ও ধর্মের প্রতি চরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস।

৬ ডিসেম্বর হলো সেই আরাধ্য পুরুষের কারামুক্তির দিন। তাই আমাদের এই একটি মাত্র ৬ ডিসেম্বরে থেমে গেলে চলবে না। এখনও যে কাশী মথুরার মতো অসংখ্য ধর্মস্থান অপমানের তীব্র বেদনা নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে মুক্তিলাভের আশায়। সেই যন্ত্রণার লাঘব না হওয়া পর্যন্ত থামি কী করে?

স্বাধীনতার অমৃতমহোৎসবের এই পুণ্যবরষে দেশ স্বাধীনতার নতুন অর্থ ফিরে পাক। স্বাধীনতার মানে দুই সিংহাসন লোভী নেতার 'Two Nation Theory'-র দেশ ভাঙা আর শাসন করার চক্রান্ত নয়, স্বাধীনতার মানে ভিক্ষা চেয়ে দয়ার দানে পাওয়া 'টুকরো দেশের' রাজা হওয়া নয়, বরং স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ দেশ-ধর্ম-সমাজ-আচার-বিচারের স্ব-অধীনতা--- এই শুভবর্ষে তার প্রতিফলন ঘটুক। আর ৬ ডিসেম্বর ততদিন পর্যন্ত এদেশের বুকে বারে বারে ফিরে আসুক যতদিন না জাতি বিদেশি অত্যাচারের কলঙ্ক চিহ্নগুলোকে নিঃশেষ করে স্বাভিমান প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। ▫

কলঙ্ক পেরিয়ে রামরাজ্যে ফিরছে দেশ

হীরক কর

দিনটা ছিল একটা অলস রবিবার। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর দিনটা শুরু হয়েছিল ভোর ৫ টায়। অন্য আর পাঁচটা দিনের মতো সাদামাটা ভাবেই। কিন্তু বিকেলে সেই দিনটাই ভারতবর্ষের একটা 'উজ্জ্বল' দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

তখন টেলিভিশন বলতে শুধুমাত্র 'দূরদর্শন'। সকাল থেকেই দেখানো হচ্ছিল অযোধ্যায় 'রামলালা'র ওপর 'বাবরি মসজিদ' নামক একটি ধাঁচায় করসেবা করছেন করসেবকরা। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ ওই ধাঁচার ওপর চড়ে বসলেন করসেবকরা। শুরু হলো ধাঁচা ভাঙার কাজ। ক্রমে ক্রমে কলকাতা শহরে ছড়িয়ে পড়ল বাবরি মসজিদ নামক একটি মসজিদ ভেঙে ফেলেছে করসেবকরা। বিকেলে পুরো বাবরি মসজিদ ভেঙে পড়তেই রাস্তাঘাট প্রায় শুনশান হয়ে গেল।

বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। বিভিন্ন জেলায়ও একই ধরনের বিক্ষোভ মিছিল হয় বাবরি অ্যাকশন কমিটির ব্যানারে। দুপুরের মধ্যে সেই বিক্ষোভ পরিণত হয় সহিংসতায়। লাঠিসোটা নিয়ে হিন্দুদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর এমনকী মন্দিরেও হামলা চালানো হয় এসব মিছিল থেকে। বেশ কয়েকটি এলাকায় জুয়েলারি দোকান, মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, হোটেল ও রেস্তোঁরা-সহ হিন্দু মালিকানাধীন দোকানপাটে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

কলকাতায় কার্ফু ঘোষণা করা হলো। সেনা নামানো হলো কলকাতার রাস্তায়। শুনশান রাস্তায় আর্মির টহল। ৭ ডিসেম্বর লালবাজারে কলকাতা পুলিশের কন্ট্রোল রুমে গেলে জানানো হলো সবাইকে কারফিউ পাস নিতে হবে। আর অপ্রয়োজনে বেরোনো যাবে না। বেরোলে সঙ্গে থাকতে হবে কারফিউ পাস। অনেকটা এখনকার মাস্ক, স্যানিটাইজার বা লকডাউনে 'ই-পাস'-এর মতো। আর মিলিটারি বা পুলিশের গাড়ি দেখলেই হাত তুলে ধীরে ধীরে এগোতে হবে। কেননা কুখ্যাত গুন্ডা 'মোগল' ও 'ঔরঙ্গজেব'-দের সৌজন্যে বেগরবাই দেখলেই 'সাইট অ্যান্ড শুট' এর নির্দেশ ততক্ষণ জারি হয়ে গেছে। ওই দিনগুলোতে মানুষের খাদ্য সংস্থানের একমাত্র ভরসা ছিল পাড়ার দোকান। দোকানের শাটার ফাঁক করে কোনওমতে চাল, ডাল, তেল, নুনের জোগাড় হতো। একসময় পাড়ার দোকানগুলোতেও সঞ্চয় শেষ হতে লাগল। তাই চারদিনের মাথায় কলকাতা থেকে একঘণ্টার জন্য কার্ফু শিথিল করা হয়েছিল। সন্ধ্যে ৬টা থেকে ৭টা। এই হানাহানিতে ৪৪ জনকে কলকাতা তখন হারিয়ে ফেলেছে।

১৯৯২ সালে কলকাতায় যে দাঙ্গা হয়েছিল,

অবশেষে আইনি

১৫২৮ সালে মুঘল সম্রাট বাবরের নির্দেশে এই মসজিদ তৈরি হয়েছিল। ইতিহাস সাক্ষী যে রামমন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। এই স্থানটি ছিল রামজন্মভূমি। যদিও এই দাবি কোনওকালেই মানেনি বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি। এদিনটি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের পক্ষ থেকে 'শৌর্য দিবস' হিসাবে পালন করা হয়। অন্যদিকে বাবরি অ্যাকশন কমিটি ৬ ডিসেম্বরের দিন 'ইয়াম ই গম' (দুঃখের দিন) হিসাবে পালন করে। বাবরি ধাঁচা অপসারণের পর ভারতের নানা প্রান্তে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তাতে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের ১০ মাস পর চার্জশিট দেয় সিবিআই। সেই চার্জশিটে বত্রিশ জন ছিলেন অভিযুক্ত। সঙ্গে আরও লাখো অজ্ঞাত পরিচয় করসেবক। প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে নাম ছিল লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলী মনোহর যোশী, উমা ভারতীর। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং, বিজেপি নেতা বিনয় কাটিয়ার, সাক্ষী মহারাজ, ভিএইচপি নেত্রী সাধ্বী ঋতম্ভরা এবং রাম জন্মভূমি ট্রাস্টের সভাপতি নৃত্যগোপাল দাস ও সম্পাদক চম্পত রাইয়ের নামে চার্জশিট দেয় সিবিআই। সবমিলিয়ে ৪৮ জন ছিলেন অভিযুক্তের তালিকায়। মামলা চলাকালীন ১৬ জন মারা যান। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন, বিশ্বহিন্দু পরিষদ নেতা অশোক সিঙ্ঘল, গিরিরাজ

সংগঠিত চরিত্রের পাশাপাশি তার অর্থনৈতিক একটা চরিত্রও ছিল। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের অব্যবহিত পরে মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ- সহ দক্ষিণ-পশ্চিম ও পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে দাঙ্গা হয়, তার পিছনে প্রধান চালিকাশক্তি যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নয়, বরং প্রোমোটার-পুলিশ-রাজনীতিকের ত্র্যহস্পর্শে গড়ে ওঠা এক জমি দখলের ষড়যন্ত্র তা বুঝতে কারোই সময় লাগেনি। এখন যত দিন যাচ্ছে, ততই দাঙ্গার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির যোগ শক্তিশালী হচ্ছে।

৬ ডিসেম্বর দুপুর ১টা ৫৫ মিনিটে ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় একটি গম্বুজ ভেঙে ফেলে করসেবকরা। হাতে পতাকা নিয়ে ক্রুদ্ধ করসেবকরা তখন বিজয়োল্লাসে মেতেছে। কেউ-কেউ স্লোগান তুললেন, 'এক ধাক্কা অওর দো'। বিকেল ৪টা ৪৯ মিনিটে ভেঙে পড়ল মূল গম্বুজ। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ উত্তর প্রদেশ-সহ দেশের অনেক রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। এর জেরে উত্তরপ্রদেশে জারি করা হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। সেইসময়ে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন কল্যাণ সিং।

২০২০ সালের আগস্ট, প্রথমে ভূমিপূজা। তারপর শিলান্যাস। পুরোপুরি বৈদিক আচার মেনে শেষ হয় ভূমিপূজা। বিধি মেনে তা পালন করেন প্রধানমন্ত্রী। অবশেষে রুপোর ইট দিয়ে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের সূচনা করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমনকী ওই দিন প্রধানমন্ত্রীর ভূমিপুজোর অন্যতম প্রধান দর্শক ছিলেন স্বয়ং তাঁর মা হিরাবেনও।

সারাদেশে নিধি সংগ্রহে ভালো সাড়া মেলায় এবার মন্দির নির্মাণস্থলের এলাকা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র স্ট্রাস্ট। এমনকী নতুন জমি কেনার কাজও শেষ হয়েছে। রাম মন্দিরের জন্য বরাদ্দকৃত জমির লাগোয়া আরও প্রায় ৭ হাজার ২৮৫ স্কোয়ার ফুট জমি কিনেছে রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট। মন্দির ক্ষেত্রের পরিসর বাড়ানো ও আরও একাধিক প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্যই নতুন করে

যুদ্ধে জয়ী হলেন শ্রীরামচন্দ্র

কিশোর, বিষ্ণুহরি ডালমিয়া ও শিবসেনা সুপ্রিমো বাল ঠাকরে। ২০০৩-এ সিবিআই আর একটি চার্জশিট দিলেও, রায়বরেলির আদালতের নির্দেশে প্রমাণ না থাকায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ছাড়াই আডবাণীদের বিরুদ্ধে এগোতে থাকে মামলা। ২০১০ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টও নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রাখে। আডবাণীদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়। ২০১১ সালে করা সিবিআইয়ের আবেদনের ভিত্তিতে ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দেয় এলাহবাদ হাইকোর্টের রায়। আডবানি-সহ ১৪ জন নেতার বিরুদ্ধে ফিরে আসে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই লখনউয়ের সিবিআই আদালতে করসেবকদের বিরুদ্ধে এবং আডবাণীদের বিরুদ্ধে ২টি মামলার একসঙ্গে শুনানি শুরু হয়। ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, নিয়মিত শুনানি করে ২ বছরের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। একাধিকবার সেই সময়সীমা বাড়ানো হয়। মামলা শেষ করতে লখনউয়ের আদালতের বিচারক সুরেন্দ্র কুমার যাদবের অবসরের দিন পিছিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। বাবরি ধ্বংস মামলায় সাড়ে তিনশো জনের সাক্ষ্য শুনেছে নিম্ন আদালত। খতিয়ে দেখা হয় প্রায় ৬০০ নথি। ইতিমধ্যেই কেটে যায় তিন দশক। গঙ্গা-গোদাবরী দিয়ে গড়িয়ে যায় অনেক জল। ২০১৯-এর ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়ে বলা হয়, বাবরি মসজিদের ২ দশমিক ৭ একর জমি হিন্দুদের দেওয়া হবে রামমন্দির নির্মাণের জন্য। আর অযোধ্যায় বিকল্প কোনো স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের দেওয়া হবে ৫ একর জমি। অযোধ্যার যে ২.৭৭ একর জমিকে বিরোধের মূল কেন্দ্র বলে গণ্য করা হয়, তার মালিকানা দেওয়া হয়েছে 'রামলালা বিরাজমান' বা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শিশুরূপের বিগ্রহকে। যার অর্থ সেখানে রামমন্দিরই তৈরি হবে। ভারতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-র নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ ওই দিন সর্বসম্মতিক্রমে এই রায় দেন। প্রধান বিচারপতি ছাড়া বেঞ্চের অন্য বিচারপতিরা ছিলেন এস এ বোড়দে, ওয়াই ভি চন্দ্রচূড়, অশোক ভূষণ এবং এস আবদুল নাজির।

প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ

বিচারপতি এস এ বোবডে

বিচারপতি ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়

বিচারপতি অশোক ভূষণ

বিচারপতি এস আব্দুল নজির

আদালতের ভরসা ইতিহাসে

এক হাজার পঁয়তাল্লিশ পাতার ওই রায়ের প্রায় শেষের দিকে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, তাদের সিদ্ধান্তের অন্যতম মূল ভিত্তি ছিল পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণসমূহ। দ্বাদশ শতকের একটি বড় কাঠামো মাটির নীচে পাওয়া গেছে, যেটির মোট ৮৫টি স্তম্ভ ছিল। রায়ে আরও বলা হয়, ওই কাঠামোটি হিন্দু কোনও স্থাপত্য হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। যে মসজিদ নিয়ে বিতর্ক, সেটির ভিত তৈরি হয়েছিল আগে থেকে নির্মিত কোনও কাঠামোর ওপরে। ধাপে ধাপে যখন খননকার্য চালানো হয়েছে, তখন একটি গোল উপাসনাস্থল পাওয়া গেছে, যেখানে একটি 'মকর প্রণালী'ও ছিল। সেখানে অষ্টম থেকে দশম শতাব্দী সময়কালে হিন্দুরা পুজো করতেন এমন ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। রায়ে বলা হয়, যদিও পুরাতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী মন্দিরের মতো একটি কাঠামো পাওয়া গেছে, তবে সেই রিপোর্টে এটা স্পষ্ট হয়নি যে ওই পুরনো কাঠামোটি কীভাবে ধ্বংস হয়েছিল। তা ছাড়া 'ওই কাঠামোটি ভেঙেই মসজিদ তৈরি হয়েছিল কী না'— সেই প্রমাণও পাওয়া যায়নি। রিপোর্টটিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ 'টাইম গ্যাপ' রয়েছে বলেও আদালতের রায়ে উল্লেখ করা হয়।

দেশের সর্বোচ্চ আদালত বলেছে, মাটির নীচে থাকা পুরনো কাঠামোটি যদি দ্বাদশ শতাব্দীর হয়, তাহলে ষোড়শ শতাব্দীতে মসজিদ তৈরির সময়ের সঙ্গে চারশো বছরের একটা ফারাক থাকছে। ওই চারশো বছরে কী হয়েছিল তা জানা যায় না 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'-র ওই রিপোর্ট থেকে।

পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বা এ এস আইয়ের রিপোর্ট থেকে বারে বারে উদ্ধৃত করলেও আদালতের রায়ে বলা হয়, শুধুমাত্র পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণের ওপরে কোনও আদালত জমির মালিকানা নির্ধারণ করতে পারে না। সেজন্য ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দুই পর্যটকের লেখাকেও গুরুত্ব দিয়েছে কোর্ট। সেগুলি থেকে আদালত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছে, প্রথমত, হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে বিতর্কিত জমিতেই ভগবান রামের জন্ম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আশেপাশের কয়েকটি উপাসনাস্থল— যেমন সীতা রসোই, স্বর্গদ্বার প্রভৃতি দেখেও মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে ওই জায়গাতেই ভগবান রামের জন্ম হয়েছে। তৃতীয়ত, বিতর্কিত জমিটিতে যে পূজা–অর্চনা হতো, আর নানা ধর্মীয় উৎসবে ওই জায়গায় বহু মানুষের সমাগম হতো। চতুর্থত, ব্রিটিশরা অওধের (অযোধ্যা) দখল নেওয়ার আগে থেকেই ভক্ত সমাগম আর পুজো হতো ওই জমিতে। আদালতের কাছে যা তথ্য প্রমাণ হাজির করা হয়েছে, তাতে বিচারপতিদের সিদ্ধান্ত যে, মসজিদ থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরা সেখানে পুজো-অর্চনা করা বন্ধ করে দেননি।

এই জমি কেনা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ট্রাস্টের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। আশারফি ভবনের পাশেই ট্রাস্টের এই নতুন জমি কেনা হয়। আগে মন্দির নির্মাণ স্থলের জায়গা ছিল ৭০ একরের আশেপাশে। নতুন জমি কেনার ফলে তা বর্তমানে বেড়ে হচ্ছে ১০৭ একর। প্রায় ১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নতুন জমি কিনেছে রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট। মূলত মন্দিরের পরিসর বাড়ানোর জন্যই এই বিশাল পরিমাণ নতুন জমির প্রয়োজনীয়তা বলে জানিয়েছেন রাম জন্মভূমির অন্যতম প্রধান ট্রাস্টি অনিল মিশ্র। এদিকে সূত্রের খবর, মূল মন্দির খুব সম্ভবত থাকবে পাঁচ একর জমির মধ্যে। বাকি ১০২ একর জমির মধ্যে থাকবে অন্যান্য ব্যবস্থা। মোট ১৪ লক্ষ ৩০ হাজার ১৯৫ স্কোয়ার ফুট এলাকায় থাকবে একটি বিশালাকার মিউজিয়াম, লাইব্রেরিও। স্থাপত্যের নকশাকারী প্রতিষ্ঠান লারসেন অ্যান্ড টুব্রো যে নকশা জমা দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ভূ পৃষ্ঠ থেকে ২০-৪০ মিটার গভীরে ১২০০ কংক্রিট পিলার বসানো হবে। মন্দিরটি তৈরি হচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী। মোট ১২৫ ফুট উচ্চতার। যদিও তা বাড়িয়ে ১৬০ ফুট করার প্রস্তাব এসেছে নানা জায়গা থেকে। মন্দিরের প্রথম তলা ১৮ ফুটের। সেখানে থাকবে রাম লালার মূর্তি। দ্বিতীয় তলা হবে ১৫ ফুট ৯ ইঞ্চির। এই দ্বিতীয় তলা 'রামের দরবার' হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

ইস্পাত ও ইটের পরিবর্তে, তিন তলা বিশিষ্ট এই মন্দির নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে মার্বেল ও পাথর। ২০২৫ সালে মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও, ভক্তদের জন্য এক সুখবর দিয়েছে রামমন্দির ট্রাস্ট কমিটি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরেই ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হবে রাম মন্দিরের দরজা।

সনাতন সভ্যতার প্রতিরূপ হয়ে উঠবে রামমন্দির

অনামিকা দে

ভব্য রামমন্দির সম্পূর্ণ হওয়ার পর কেমন হবে? শিখর পর্যন্ত মোট উচ্চতা ১৬১ ফুট, মোট তিনটি তলায় মন্দির ভবন নির্মিত হবে। প্রত্যেক তলার উচ্চতা ২০ ফুট, মণ্ডপ সংখ্যা ৫টি। সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল ২.৭ একর, মোট নির্মাণ ক্ষেত্র ৪৭,৪০০ বর্গফুট। মোট দৈর্ঘ্য ৩৬০ ফুট, মোট প্রস্থ ২৩৫ ফুট।

শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট-এর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে প্রথম পর্বের কাজ শেষ হয়েছে। করোনা মহামারীজনিত কারণে প্রচুর বাধা থাকা সত্ত্বেও অযোধ্যায় বহুল প্রত্যাশিত রামমন্দির নির্মাণের কাজ পুরোদমে চলছে। ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই বলেছেন— 'প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। আমরা এই কংক্রিটের ভিত্তির উপরে কর্ণাটকের গ্রানাইট এবং মির্জাপুরের বেলেপাথর দিয়ে তৈরি আরেকটি স্তর স্থাপন করব।' ট্রাস্টের অন্য সদস্য অনিল মিশ্র জানিয়েছেন, 'মির্জাপুর থেকে গোলাপি পাথর ব্যবহার করে মন্দিরের প্লিন্থের কাজ এই বছরের ডিসেম্বরে শুরু হবে।' তিনি আরও বলেন 'বিল্ডিং উপাদানের ১০ ইঞ্চি চওড়া পরিমাপের প্রায় ৫০ ফুট গভীর ভিত্তি স্থাপন করা হবে।'

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাছে রামায়ণ এক ইতিহাস। এই ইতিহাস কোনো সময় বিশেষের ঘটনাবলীর ইতিহাস নয়। অন্য ইতিহাস কালে কালে কত পরিবর্তন হয়েছে— এই ইতিহাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এই ইতিহাস চিরকালীন এবং শাশ্বত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন— 'ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যরহস্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।' আজ সেই ইতিহাস বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান। প্রাচীনতম সনাতনী সভ্যতার ভাবধারাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে স্বাভিমানের সঙ্গে রামরাজ্য নির্মাণের মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেই আজ আমরা সংকল্পবদ্ধ।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী রামমন্দির নির্মাণকার্য বর্তমানে সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ভাবে চলছে। অত্যাধুনিক মেশিন ও অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে হচ্ছে নির্মাণ। গ্রাউন্ড লেভেলের ভিত্তির কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এখন প্লিন্থ লেভেলের কাজ শুরু হবে। আরও ১০ ফুট পাথর বসানোর পর পিলারের কাজ শুরু হবে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষ পাথর আনানো হয়েছে। এই মুহূর্তে ভরতপুরের বিশিষ্ট পাথর আনানো হয়েছে, সেই পাথরের কাজ চলছে। প্রথমে যে ডিজাইন করা হয়েছিল তাতে মন্দিরের তিনটি গম্বুজের রেপ্লিকা ছিল। নিধিসংগ্রহ কর্মসূচির পর যে বিপুল ধনরাশি সংগ্রহ হয়েছে তাতে বর্তমান মন্দিরটির ডিজাইনে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পাঁচটি গম্বুজের মন্দির ডিজাইন করা হয়েছে।

সুতরাং ভবিষ্যতের রামমন্দির হবে ভব্য, সুন্দর, বৃহৎ। মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে সংগ্রহশালা। গবেষণাগার, প্রেক্ষাগৃহ, অতিথিভবন, থাকবে সবুজের সমারোহ। এই অতি প্রাচীন নগরীতে মন্দিরকে কেন্দ্র করেই সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পুণ্য অর্জন ও পর্যটনের কারণে বহু মানুষ এখানে আসবেন। এলাকার অর্থনীতিতে জোয়ার আসবে সে কথাও সত্য। কিন্তু আসল বিষয় হলো মন্দিরের 'আধুনিক রূপ'। প্রধানমন্ত্রী এই শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। মন্দির পরিচালনায় সর্বক্ষেত্রে যেন আধুনিকতা থাকে। এই মন্দির আগামীদিনে

কর্ণাটকের গ্রানাইট মির্জাপুরের বেলেপাথর

কেমন চলছে মন্দিরের কাজ? প্রথম পর্বের ভিতরচনার কাজ শেষ। দ্বিতীয় পর্বের ভিত রচনায় ব্যবহার করা হচ্ছে কর্ণাটকের গ্রানাইট পাথর এবং মির্জাপুরের বেলেপাথর। এই পর্বের কাজ শেষ হবে ডিসেম্বরের গোড়ায়। এরপর শুরু হবে সর্বনিম্নতল নির্মাণের কাজ। এখানেই থাকবে গর্ভগৃহ।

রামলালা বিরাজ করবেন সেখানে। দ্বিতীয় পর্বের কাজে চারটি স্তর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাস্ট। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০৭ মিটার উঁচুতে থাকবে মন্দিরের ভিত। প্রথমে ৪৪টি স্তর নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল, এখন তা বেড়ে হয়েছে ৪৮টি। মন্দিরের ভিত্তি নির্মাণের কাজে সাত ফুট উচ্চতার স্তম্ভ তৈরি করা হবে। এই নির্মাণে ব্যবহার করা হবে সিমেন্ট। উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত যা নির্মাণ হয়েছে তাতে সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়নি। ব্যবহার করা হয়েছে পাথর এবং ফ্লাই অ্যাশ। এর কারণ সিমেন্ট ব্যবহার করা হলে নির্মাণ খুব সহজেই গরম হয়ে যায়। স্তম্ভমূল নির্মাণের কাজে ৩.৫ লক্ষ কিউবিক ফুট পাথর ব্যবহার করা হবে। এই পাথর আসবে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর থেকে। মন্দির কমপ্লেক্সে রামমন্দির ছাড়াও থাকবে সূর্য, গণেশ, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার মন্দির। মন্দিরের সুপারস্ট্রাকচার নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

মানুষের কাছে হিন্দুধর্মের উদারতার, তার সবাইকে গ্রহণ করার, তার মুক্ত চিন্তার কথা যেন প্রচার করতে না ভোলে। প্রধাননন্ত্রী বলেছেন এই মন্দির যেন 'নর কে নারায়ণ, হিসাবে দেখে, বর্তমানকে অতীতের সঙ্গে জোড়ে'। শুধু জাঁকজমকে বৃহদায়তনে নিজের সম্পদের বাহুল্য। তার গগনচুম্বী রূপেই এই মন্দির যেন আমাদের দৃষ্টি না ভোলায়। পবিত্রতা, অন্তরের প্রশান্তি, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হৃদয়ের আত্মসমাহিত ভাব, জীবে প্রেম, মন্দির ও তার প্রাঙ্গণ যেন এই সকল মহৎ সনাতনী সংস্কৃতি আমাদের চিত্তে জাগিয়ে তোলে কাল থেকে কালান্তরে। কোনো পারিপার্শ্বিক সামাজিক বা রাজনৈতিক রঙ স্পর্শ করতে না পারে এঁকে। সনাতন সভ্যতার প্রাচীনত্ব, এর গরিমা যেন মাথা উঁচু করে সর্বকালের কালজয়ী সৌধে পরিণত হয়। আমরা অপেক্ষা করে আছি ২০২৩-এর সেই শুভক্ষণের জন্য যেদিন সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হবে, ভক্ত ও ত্রিকালজয়ী পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের পুর্নমিলন ঘটবে ভব্য মন্দির প্রাঙ্গণে।

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রস্তাব দিয়েছেন মন্দিরের গর্ভগৃহ এমনভাবে তৈরি করা হোক যাতে প্রত্যেক বছর রামনবমীর দিন সূর্যের প্রথম কিরণ রামলালার ওপর এসে পড়ে। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব মাথায় রেখে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই মহাকাশ বিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ এবং প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। জানা গেছে, গর্ভগৃহ তৈরি হবে কোনারকের সূর্যমন্দিরের আদলে। উল্লেখ্য, সূর্যের প্রথম কিরণে আলোকিত হয়ে ওঠে সূর্যমন্দিরের গর্ভগৃহ। রামমন্দিরের ক্ষেত্রেও রামনবমীর দিন অন্তত কিছুক্ষণের জন্য তেমনটাই চাইছেন প্রধানমন্ত্রী।

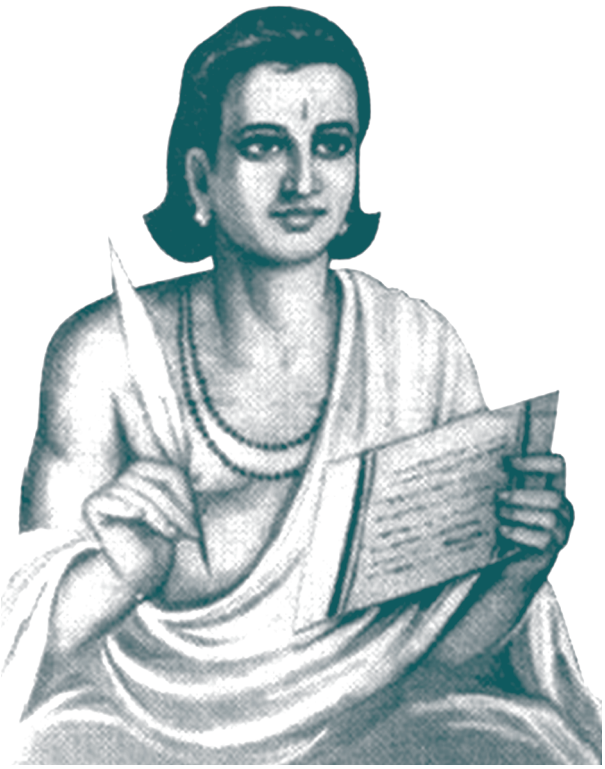

মহাকবি কালিদাসের মৃত্যুরহস্য

ড. অশোক দাস

ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে বিদ্যাবতীর সখীরা বলতে লাগলেন— জিতেন্দ্রিয় কালী ও সরস্বতীর সাধনায় সিদ্ধপুরুষ কালিদাস। কিন্তু তাঁর মৃত্যু আজও ভারতবাসীর কাছে গূঢ় রহস্যাবৃত। তাঁকে কেন, কীভাবে হত্যা করা হয়েছে তা বলছি শুনুন... পণ্ডিত দামোদরের পরিচয় পত্রটি হাতে নিয়ে বিক্রমাদিত্যের রাজ সভায় যখন পৌঁছলেন তখন বিক্রমাদিত্যের বিজয়রথ ছুটে চলেছে আসমুদ্র হিমাচল। বিক্রমাদিত্যের রাজপুরীটি ছিল বিহার রাজ্যে পাটলিপুত্রে, যার বর্তমান নামকরণ হয়েছে পাটনা। প্রাচীনকালে পাটনার দক্ষিণে প্রবাহিত ছিল গঙ্গা। তারই উত্তরপার্শ্বে ছিল বিক্রমাদিত্যের রাজপুরী। বর্তমান সেটি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বিক্রমাদিত্য ছিলেন কঠোর কর্মক্ষম, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করতেন নিজ হাতে। তাঁর অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি, অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান, তাছাড়া তাঁর একটি মহৎ গুণ ছিল তিনি মনীষীদের সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁদের কাছ থেকে সুপরামর্শ নিতেন। তাই তিনি রাজ্য পরিচালনার জন্য গড়ে তুলেছিলেন নবরত্ন পণ্ডিতসভা। এই পণ্ডিত মণ্ডলীর কথাগুলি মন দিয়ে শুনতেন। বিচার বিশ্লেষণ করে যা কিছু করণীয় তা করতেন তদ্‌মুহূর্তে। যারা অসৎ আচরণে লিপ্ত হতো তাদের জন্য ছিল কঠিন কঠোর শাস্তি, এমনকী পৃথিবী থেকে চলে যেতে হতো চিরতরে। তাঁর হৃদয় যেমন ছিল কঠিন কঠোর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় ভয়ংকর, তেমনই কুসুমের ন্যায় কোমল। নবরত্ন পণ্ডিত সভায় পণ্ডিতগণ হলেন— ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি। এই নবরত্ন সভার শ্রেষ্ঠ আসন অলংকৃত করেছিলেন পণ্ডিত বরাহ। তারপর সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি গ্রহণ করেন মহাকবি কালিদাস। কালিদাস রাজকন্যা বিদ্যাবতীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ না করায় রাজ পরিবারের মধ্যে নেমে এল গভীর শোকের ছায়া। সেই সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মহাকবি কালিদাস এবং গুরুকুল আশ্রমের পণ্ডিত দামোদর। যদি কোনো চরম অপরাধী ব্যক্তি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজাগণ তাঁদের কোনো শাস্তি দিতেন না। যে রাজ্যে সন্ন্যাসীরা বসবাস করতেন তাদের বসবাসের সকল রকম সুব্যবস্থা করেতেন, কারণ সন্ন্যাসীরা সমাজের মানুষের এগিয়ে যাওয়ার পথের দিশারি। মহাকবির হৃদয়ে শৈশব থেকেই আকাঙ্ক্ষা ছিল সন্ন্যাস গ্রহণের। গুরুকুল আশ্রমে বারো বছর ব্রহ্মচর্য পালনের পর জনকপুর ধামে কাম্‌তৌল মুনির নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাই তাঁর সন্ন্যাস নামকরণ হয় কালিদাস। মাকালীর সাধক ছিলেন বলেই গুরুদেব এই নামকরণটি করেছিলেন।

অতীতে উচ্চপীঠ গ্রামের পণ্ডিতদের ভুল সিদ্ধান্তে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তাই পণ্ডিত দামোদর দেবেন্দ্রর সঙ্গে পরামর্শ করে জানিয়ে দিলেন— গুরুকুল আশ্রমের দায়িত্বভার তিনি আর বহন করতে পারছেন না। সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন এই ঘটনা সবই ঈশ্বর নির্দিষ্ট। সীতা না হলে শ্রীলঙ্কা ধ্বংস হতো না। শ্রীলঙ্কা ধ্বংস না হলে শ্রীরামচন্দ্র দেবসিংহাসনে আরোহণ করতে পারতেন না। দ্রৌপদীর জন্য ধ্বংস হয়েছে অভিমানী দুর্যোধন। তাই যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। তাই আগুন নেভাবার জন্য বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় পাঠিয়েছি মহাসাধক কালিদাসকে। আমি অন্তর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি— ভারতীর রত্ন সিংহাসনে হর-পার্বতীর ন্যায় বসেছেন কালিদাস ও বিদ্যাবতী! দেবরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্র পণ্ডিত দামোদরকে প্রণাম জানিয়ে বললেন— এখন থেকে এই গুরুকুল আশ্রমের দায়িত্বভার নিজ হাতে গ্রহণ করলাম। আপনার সকল উপদেশ দেবরাজকে বুঝিয়ে বলব।

দেবরাজ উচ্চপীঠ নগরীর পণ্ডিতগণকে নিজ নিজ বাসভূমিতে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন এবং স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকেই উচ্চপীঠ নগরীটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন। ঋষিতুল্য পণ্ডিত দামোদর ছিলেন অকৃতদার। অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে সঙ্গে নিয়ে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে চলে গেলেন এবং সেখানে নতুনভাবে জীবনযাপন শুরু করলেন। বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তরুণ নবীন পণ্ডিত কালিদাস। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খ্যাতিবান পণ্ডিত ছিলেন বরাহ। তিনি ছিলেন নালন্দা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। পরে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। অভ্রান্ত জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য বিক্রমাদিত্য তাঁকে নিয়ে আসেন তাঁর রাজসভায়। বরাহ পণ্ডিতদের কোনো পুত্রসন্তান না থাকায় দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখেন মিহির। এই দত্তক পুত্র মিহির বরাহ পণ্ডিতের অবর্তমানে নবরত্ন সভার পাণ্ডিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত যাতে হতে পারে সেই ভাবে তাকে সযত্নে জ্ঞানবান, গুণবান, চরিত্রবান করে গড়ে তুলতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর চিন্তা ভাবনায় শেষ পর্যন্ত ঘটল অঘটন। এই দত্তকপুত্র মিহিরকে নিয়ে রাজপরিবারের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে জ্বলে উঠল অশান্তির আগুন। নবীন পণ্ডিত কালিদাস বিক্রমাদিত্যের রাজপরিবারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইলেন না। তিনি চাইলেন যেখানে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, সবুজ শস্য শ্যামল খেত, গঙ্গার কুলকুল ধ্বনির মধ্যে লুকিয়ে থাকা অমূল্য সাহিত্যের রত্ন ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়ে উঠবে মহাকবির সামনে। সূর্যের সোনালি আলোয় ঝলমল করে উঠবে প্রকৃতির সোনা, রুপো, হিরের খনিগুলি। মণিকাঞ্চনের মালা গেঁথে পরাবেন ভারতজননীকে। তাই বেছে নিলেন গঙ্গার তীরে কালীমায়ের মন্দিরের স্থানটিকে। মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসের পছন্দ অনুসারে গঙ্গার তীরে পাটলিপুত্রে কালীমায়ের মন্দিরে বসবাসের সুবন্দোবস্ত করে দিলেন।

বিক্রমাদিত্যের সভার পণ্ডিতগণকে বসবাসের জন্য দশ একর জায়গা এবং প্রত্যেককে এক একটি গ্রাম দান করেছিলেন। এক একটি গ্রাম থেকে যে রাজস্ব আদায় হতো তাই গ্রহণ করতেন পণ্ডিতগণ। প্রত্যেক বছর যে ফসল ফলত তার ষষ্ঠমাংশের এক অংশ কর দিতে হতো রাজা পরিবারকে। কিন্তু মহাসাধক কালিদাস এই রাজপরিবার থেকে কোনো পারিতোষিক গ্রহণ করতেন না। গুরুকুল আশ্রম ত্যাগ করার সময় পণ্ডিত মশায় কালিদাসকে উপদেশ দিয়েছিলেন কম আহার করতে। কারণ তিনি প্রচুর আহার করতে পারতেন। তিন জনের আহার একাই আহার করতেন। তাই গুরুদেব বলে দিয়েছিলেন পরিমিত আহার করবে। যতদূর সম্ভব স্বপাকই শ্রেয়। যদি সম্ভব না হয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের রান্না ছাড়া গ্রহণ করবে না। যে সমস্ত উগ্র আহারে কামভাবের প্রবণতা বাড়ে সেই সমস্ত উগ্র ঝাল-টক-মিষ্টি ব্যবহার করবে না। আহার সম্বন্ধে সাবধান থাকবে। দুপুরের আহারান্তে কিছু সময় বিশ্রাম করবে। বিকেলে সম্ভব হলে পবিত্র স্থানে ভ্রমণ করবে। অন্ন আহার দুবেলা করবে না। সামান্য শুদ্ধ বসন পরবে। সাধু সঙ্গ করবে। সাধুদের উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনবে। কারো নিন্দা করবে না, কারো নিন্দা শ্রবণ করতে যাবে না। নিন্দা শ্রবণের স্থানগুলি যতদূর সম্ভব পরিত্যাগ করবে। যিনি যে ভাবে সাধন ভজন করেন তাঁকে সেই ভাবে সাধন ভজন করতে উৎসাহিত করবে। কাহারো মনে কষ্ট দেবেন না। সকলকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। মনুষ্য, পশুপাখি, বৃক্ষলতার সেবাযত্ন করবে। রাজ আদেশ বিচার বিশ্লেষণ করে মান্য করবে। সদাসত্য, স্বল্পকথা বলবে। যুবতী স্ত্রীলোককে কখনো স্পর্শ করবে না। কালিদাস এই উপদেশগুলি মনযোগ দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে লাগলেন। গুরুদেবের কথাগুলি শিরোধার্য করে অতি যত্নে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে লাগলেন। অতি ভোরে ব্রাহ্মমুহূর্তে যোগাসন সেরে নিতেন। তারপর গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে করতে গঙ্গাস্নান সেরে ফেলতেন। তারপর কালীমায়ের মন্দিরে এসে সাধন-ভজনে বসতেন। তাঁর অপূর্ব সুললিত কণ্ঠধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হতো।

এই পাটলিপুত্র ছিল তীর্থভূমি। ভারতের রাজধানী। তাই ভারতবর্ষের অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ এখানে এসে বসবাস করতেন। ধনরত্নে ভরে উঠেছিল পাটলিপুত্র। বাণিজ্যতরী বিদেশে যাওয়ার আগে সওদাগররা এই কালীমন্দিরে পুজোর ডালি নিয়ে জড়ো হতো কাতারে কাতারে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আসতেন এই কালীমন্দিরে পুজোর জন্য আশীর্বাদ নিতে। পল্লীর অসংখ্য নর-নারী জড়ো হতো মন্দিরে। মহাসাধকের বিনম্র ব্যবহারে সংসারের জাঁতাকলের তিক্ততায় জর্জরিত পল্লীর নর-নারীর হৃদয় মন মহানন্দে ভরে উঠত। দুপুরে নিরামিষ স্বপাক রান্না করতেন। আহারাদির পর সন্ধ্যার সময় বসতেন সাধন ভজন করতে। এই মন্দিরে সন্ধ্যার সময় জড়ো হতো পল্লীবাসীরা। কৃষক, জেলে, মুটে-মজুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, অস্পৃশ্য, অচ্ছুতদের ছিল অবারিত দ্বার। আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাগুলি মনযোগ সহকারে যেমন শুনতেন তেমনি তার উপায় ও প্রতিকারের ব্যবস্থা যা বলতেন সকলের মন প্রাণ জুড়িয়ে যেত। অল্পদিনের মধ্যেই সকলের হৃদয় মন জয় করে নিলেন পণ্ডিতমশায়। প্রত্যহ সকালে মন্দিরে পুজো শেষ করে চলে যেতেন রাজপ্রাসাদে। রাজপুরীর ঝি, চাকর, দাস-দাসী মহাসাধক পুরুষের আশীর্বাদে ধন্য হবে তাদের জীবন, তাই যে যেখানে থাকত ছুটে আসত প্রণাম করতে। ঠাকুরমশায়ের ভালোবাসা সহমর্মিতা, অদোষদর্শিতার গুণে সকলেই মুগ্ধ হতেন। তারপর চলে যেতেন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজকার্য পরিচালনার গৃহে, রাজকার্য আলোচনা করতে। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোনো পণ্ডিতই বিক্রমাদিত্যের কক্ষে প্রবেশ করতেন না। কিন্তু নবীন পণ্ডিত কালিদাস দ্বিধাহীন ভাবেই চলে যেতেন রাজা ও রানিমার কক্ষে। তাঁর নির্ভয় সুমধুর বিনম্র ব্যবহারে, আচার-আচরণে সকলের হৃদয় মন জয় করে নিতে থাকলেন। রানিমা পণ্ডিতমশায়ের গুণাবলী যাঁচাই করে দেখতে লাগলেন।

তিনি একদিন ডেকে বললেন— রানিমা, আমায় ক্ষমা করবেন! নিরামিষ রান্না ছাড়া আমি কখনো করি না। রানিমা বললেন— তাই হোক! তাঁর নিরামিষ রান্না আহার করে রাজ পরিবারের সকলেই মুগ্ধ হলেন। সেই সঙ্গে তার নম্রতা, ভদ্রতা, সততায় সকলেই মুগ্ধ হলেন। এই নবীন পণ্ডিতমশায় ধীরে ধীরে রাজপরিবারের সকলের প্রিয় হতে থাকলেন। তখন কোনো কোনো পণ্ডিতের অন্তরে তুষের আগুনের মতো জ্বলে উঠল হিংসা। এখানেও সকলে তাকে ডাকতেন ঠাকুরমশায়। এই ঠাকুরমশায় ছিলেন গল্পের রাজা। যখন যে কেউ কোনো সমস্যা নিয়ে আসতেন, রাজা রানিকে কোনো সমস্যার

কথা বলতেন, তখন একটা সুন্দর গল্প দিয়ে তার সমস্যার সমাধানের পথ বলে দিতেন। প্রত্যেক মানুষের বন্ধ হৃদয় খুলে যেত। অন্তরে প্রবেশ করত দৃঢ় বিশ্বাস ও কর্মপ্রেরণা। চলার পথ হতো সুন্দর সুখময়। তাই লাগামহীন মন ছুটে আসতে চাইত ঠাকুরমশায়ের কাছে। শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এমনকী রাজপরিবারের পণ্ডিতরাও তাঁর কাছে ছুটে যেতেন গল্প শোনার জন্য। রাজা ও রানিমায়ের উদ্দেশে লিখলেন বত্রিশ সিংহাসন এবং ছোটোদের জন্য বেতাল পঞ্চবিংশতি। এই বেতাল পঞ্চবিংশতির মূল পুস্তকটি বর্তমান হারিয়ে গেছে। লোকমুখে যে গুলি চলে এসেছিল বর্তমান সমাজে ওই কিংবদন্তি অনুসারে লেখা। ঠাকুরমশায় এখানে ধীরে ধীরে ঈশ্বরের নাম গানে, সাধন ভজনের দ্বারা এমন একটি পরিবেশ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করলেন যেন রাজপুরীর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন থেকে সুন্দর সুশৃঙ্খল জীবন যাপন আরম্ভ হলো। একদিন গোপনে মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঠাকুরমশায়কে ডেকে বললেন— তুমি কি বুঝতে পারছ একটি বিষয়ে আমার হৃদয়ে আগুন জ্বলছে? ঠাকুরমশায় বললেন— হ্যাঁ আমি জানি। আমি শুধু অপেক্ষা করেছিলাম আপনার মুখ থেকে কথাগুলি শোনার জন্য। আপনার রাজ্যে চতুর্দিকে জ্বলছে হিংসার আগুন। আমি দিব্য চক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি— যে কোনো মুহূর্তে জ্বলে উঠতে পারে এই রাজপুরী। পুড়ে ছাই হতে পারে রাজ সিংহাসন। ধীরে ধীরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন সেনা বাহিনীর উপর। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর পণ্ডিতরা যেভাবে রাজকীয় অর্থভাণ্ডার ধ্বংস করছে, গড্ডলিকা প্রবাহে জীবন কাটাচ্ছে। চর্তুদিকে গুঞ্জন উঠছে কেন মাঝে মাঝে বারবনিতার গৃহে যাচ্ছেন? অবাক বিস্ময়ে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে বললেন— আশ্চর্য! সত্যই ঠাকুরমশায় আপনি যা বলছেন সবই সত্যি। এখন দু'টি কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে আপনাকে। এক একজন পণ্ডিতের উপর দায়িত্বভার রয়েছে— কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, আইন-শৃঙ্খলা, সৈন্য পরিচালনা, রাজকার্য পরিচালনা, তাত্ত্বিক উপদেশ। দার্শনিক আলোচনা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। তাই গল্পের ছলে সেগুলি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন। রাজপুরীর অসংখ্য মানুষের সমস্যা হাস্যকৌতুক হেঁয়ালির ছলে সুন্দর ভাবে তার সমাধান করে দিতেন। ঠাকুরমশায়ের আচার-ব্যবহার কারুর বুঝতে অসুবিধে হতো না। তাঁর মধ্যে রয়েছে অসীম জ্ঞান। সকলে ফিরে পেত তাঁর কথার মধ্য দিয়ে কর্মপ্রেরণা। সব থেকে কঠিন কাজ হলো গোপন তথ্য আদান প্রদান। এই গোপন তথ্য আদান প্রদানের দায়িত্ব রয়েছে বত্রিশটি অপূর্ব সুন্দরী বারবনিতার উপর। যুদ্ধে যে সমস্ত পরিবারের নারীরা সর্বহারা হয়েছে তাদের দিয়ে ভারতবর্ষের রাজবাড়িতে দাস দাসীর কাজ করাচ্ছে। কয়েকশো নারীর দায়িত্বে রয়েছে বত্রিশটি সুন্দরী বারবনিতা। এই বারবনিতাদের কাছ থেকে গোপন তথ্যের দায়িত্বভার নিতে হবে তোমাকে। একটি রাজপরিবার কেমন অবস্থায় রয়েছে, কী করছে, কোনো সময়ে রাজকীয় মর্যাদায় কোনো সময় ছদ্মবেশে সারা ভারতবর্ষের রাজ পরিবারগুলি ঘুরে ঘুরে দেখবে। প্রতিমাসে একবার করে সঠিক সংবাদ দিয়ে যাবে। তথাস্তু বলে পরিদিন প্রভাতে বেরিয়ে পড়লেন। একদিন নিভৃতে রাজা ও রানিমা পণ্ডিতমহাশয়কে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বললেন— পঁচিশ বছর আগে আপনি যখন মিথিলা রাজ্য জয়ের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করছেন তখন গুপ্তচর মারফত মিথিলার রাজা মহাদেব রাজ্যসভার তিনজন পণ্ডিতকে পাঠিয়েছিলেন আপনার রাজপ্রাসাদে সন্ধি স্থাপনের জন্য। নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, যখন আপনি সন্ধি স্থাপনে রাজি হলেন না তখন কুলপুরোহিত-পিতা বিশ্বশ্বর আপনাকে বলেছিলেন— ক্রোধ, হিংসা, অহংকার মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। রাবণ সবংশে ধ্বংস হয়েছে অহংকারে। অসংখ্য বীর যোদ্ধা থাকা সত্ত্বেও অভিমানী দুর্যোধন সবংশে ধ্বংস হয়েছে।

একবার আপনি সাম্রাজ্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন পবিত্র গঙ্গার উপর দিয়ে বইছে রক্তের স্রোত। দুপারে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মৃতদেহ শৃগাল, কুকুর-শকুনি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আহত অসংখ্য মানুষ মৃত্যু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। হিংসার দ্বারা রাজ্য জয় করা যায় কিন্তু শান্তি পাওয়া যায় না। মিথিলা রাজ্যটিকে দুর্বল ভাবার পরিণতি কী ঘটবে তা কি ভেবে দেখেছেন? আপনি জেনে রাখুন— মিশর-গ্রিসের যুদ্ধে যে সকল রাজন্যবর্গ পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নিয়েছেন তাদের মধ্যে অসংখ্য সৈন্য রণনিপুণ যোদ্ধা রয়েছে এই মিথিলায়। যদি আপনি প্রকৃত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়ে থাকেন তবে এই সন্ধিস্থাপনে রাজি হবেন। নতুবা স্বর্গের যমরাজ আপনার জন্য দুয়ার উন্মুক্ত করে রেখেছেন। তখন রানিমা বললেন— থামুন। যদি মিথিলারাজ শত সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং শত সহস্র গাভী উপঢৌকন প্রদান করেন তবে কোনো রাজা মিথিলা রাজ্য কখনো জয় করবে না। তখন পিতৃদেব ইঙ্গিত করায় আমি মহারানির দেওয়া উপহারটি রানিমায়ের গলায় পরিয়ে দেওয়ায় রানিমা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন— খোকন; তুমি একদিন ভারতবর্ষের জ্ঞানী পণ্ডিত হবে। আমি সেই দেবরাজ জামাতা মহামূর্খ কালিদাস। তখন রানিমা জিজ্ঞেস করলেন এই রাজপরিবার থেকে সমস্ত রাজকর্মচারীরা পারিতোষিক পেয়ে থেকে তুমি কী আশা কর? পণ্ডিতমশায় বলেলেন— আমি যা পেয়েছি কোনো পণ্ডিত তা পায় না। জন্মের সময় মাকে হারিয়েছি, কৈশোরে হারিয়েছি পিতৃদেবকে। এই পৃথিবীর ধূলিকণায় হারিয়ে যাওয়া মা বাবার জন্য আকুল হয়ে কেঁদেছি। তাই ঈশ্বর আমার আকুল কান্নায় ঠিক যেন বাবা-মায়ের কাছে আমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বাবা-মায়ের সেবাযত্নের সুযোগ পাইনি, আপনারা আমায় সেই সুযোগ করে দিয়েছেন। এর থেকে আর কী আশা করতে পারি? রাজা ও রানিমা ঠাকুরমশায়ের হৃদয়স্পর্শী মধুময় কথাগুলি শুনে জড়িয়ে ধরে বললেন— কুমার গুপ্তের মতো তুমিও রাজ-পরিবারের সন্তান স্বরূপ।

(ক্রমশ)

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রমে রাম বিদেশি, রাবণ ভারতীয়

সূর্যশেখর হালদার

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রকাশিত ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস বইতে (অতীত ও ঐতিহ্য) লেখা হয়েছে রামায়ণ রাম-রাবণের যুদ্ধের গল্প; রাম শব্দের একটি অর্থ হল 'ঘোরা' (Move) এবং সেটি ইংরেজি শব্দ 'Roaming'-এর কাছাকাছি (তাই অর্থও কাছাকাছি); ইঙ্গিতে বোঝানো হয়েছে রাম যাযাবর জাতির মানুষ আর রাবণ খাঁটি ভারতীয়। অর্থাৎ দেশীয় রাজা রাবণকে হারিয়ে বিদেশি যাযাবর রাম তাঁর রাজ্য দখল করেন। আর বিজয়ীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা হয়েছে রামায়ণ যাতে রাবণকে রাক্ষস বা অসুর বলে ছোট করা যায়। এখন এই বক্তব্যের সত্যতা বিচার করা যাক।

প্রথমত, রামায়ণ কোনও গল্প নয়, এটি আদিকাব্য। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণকে সাতটি কাণ্ডে ভাগ করেছেন (অনেক পণ্ডিতের মতে উত্তর কাণ্ড প্রক্ষিপ্ত)। কাণ্ডগুলি কতকগুলি সর্গে এবং সর্গগুলি শ্লোকে বিভক্ত। প্রতিটি সর্গের সমাপ্তিতে কবি রামায়ণকে 'আদিকাব্য' বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন বালকাণ্ডের নবম সর্গের শেষে বাল্মীকি লিখেছেন—

''ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয় আদিকাব্যে বালকাণ্ডে নবমস্বর্গ'' (এভাবেই সমাপ্তিলাভ করছে বাল্মীকি রচিত আদিকাব্য পবিত্র রামায়ণের বালকাণ্ডের নবমসর্গ)। এই বর্ণনাতে পরিষ্কার, রামায়ণকে মহাকাব্য নয়, বাল্মীকি আদিকাব্য বলেছেন। আমরা প্রায়শই শুনে থাকি রামায়ণ মহাকাব্য। কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণীর বইতে তো মহাকাব্য, আদিকাব্য, মহাকাব্য, গল্প সব এক।

দ্বিতীয়ত, রাম সংস্কৃত শব্দ। রামায়ণ অনুযায়ী রামাদির জন্মের এগারো দিন পরে শ্রীরাম ও তাঁর ভ্রাতাদের নামকরণ করেন মহর্ষি বশিষ্ঠ। বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের আঠারো সর্গের ২০ তম শ্লোকে এর উল্লেখ রয়েছে। সংস্কৃত অভিধান অনুযায়ী 'রাম' শব্দের অর্থ Pleasing/Delightful (আনন্দদায়ক)। 'রাম' আর 'Roaming' (ঘোরা) শব্দের মধ্যে উচ্চারণগত সাদৃশ্য থাকলেও তাদের অর্থের সাদৃশ্য আদৌ কোনও অভিধানে আছে কি? 'Roaming' শব্দের উৎপত্তি খুঁজলে দেখা যায় এটি এসেছে Middle English (মধ্যযুগ)- এর 'Romen' শব্দ থেকে। Wikitionary অনুযায়ী Old English-এ 'Ramian' বা Proto–Germanic 'Raimona' বলেও দুটি শব্দ পাওয়া যায়। যেগুলি 'Roaming' এর উৎপত্তি হতে পারে। এই শেষ দুটি শব্দ আবার এসেছে 'Raim' থেকে যার অর্থ 'to move/raise' (ঘোরা/তুলে ধরা)। অর্থাৎ 'Roam' শব্দ যে সংস্কৃত থেকে আগত, বা এর সঙ্গে 'রাম' শব্দের কোনও অর্থগত মিল আছে, এমন প্রমাণ কোথায়?

পঁয়ত্রিশ পুরুষ ধরে অযোধ্যায় রাজত্ব করে শ্রীরামচন্দ্র কীভাবে যাযাবরের বংশ হলেন বোঝা গেল না।

তৃতীয়ত, রাবণ যে দেশজ রাজা একথা অনস্বীকার্য, কিন্তু তাঁকে অসুর বা রাক্ষস বানিয়ে ছোটো করে দেখানো হয়েছে একথা স্বীকার করা কষ্টকর। এটা ঠিক রাবণের যে জন্মবৃত্তান্ত উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত হয়েছে তাতে তিনি যে রাক্ষস বংশের রাজা ছিলেন তা প্রমাণ হয় না। কারণ রাবণের পিতা বিশ্বশ্রবা মুনি ছিলেন একজন তপস্বী বা ব্রাহ্মণ। তাঁর ঠাকুরদা ছিলেন মহর্ষি পুলস্ত্য। অবশ্যই রাবণের মাতা কৈকেসী ছিলেন রাক্ষসবংশীয়া। কিন্তু এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে রাবণের শরীরে প্রবাহিত হচ্ছিল শুধু রাক্ষস নয়; ব্রাহ্মণেরও রক্ত, তিনি ছিলেন ব্রহ্মরাক্ষস।

এবারে আমরা যদি শ্রীরামের বংশ পরিচয়ের দিকে তাকাই তাহলে দেখব তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই ক্ষত্রিয়। পিতা দশরথ অযোধ্যার রাজা আর মাতা কৌশল্যা কোশল রাজ্যের (বর্তমান অওয়োধ অঞ্চল) রাজকুমারী। রামের জন্মও অযোধ্যায়, অর্থাৎ তিনিও রাবণের মতো জন্মগতভাবে ভারতীয়। এছাড়াও বালকাণ্ডের ৭০তম সর্গের ২০-৪৩ তম শ্লোক পর্যন্ত শ্রীরামের পূর্বপুরুষদের নাম রয়েছে।

এঁদের মধ্যে বাল্মীকির মতে ইক্ষ্বাকু হলেন অযোধ্য তথা সারা পৃথিবীর প্রথম অধীশ্বর, অনুমানের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয়, যে তিনি ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন (কোনো প্রমাণ অবশ্য নেই) তাহলে তাঁর চৌত্রিশ প্রজন্ম পরে জন্মানো শ্রীরাম কীভাবে ভারতের বাইরে থেকে আগত হন? পঁয়ত্রিশ প্রজন্ম ধরেও শ্রীরাম ভারতীয় হলেন না, আর মহান আকবর মাত্র দুই পুরুষেই ভারতীয় হয়ে গেলেন? (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য আকবরের ঠাকুরদা বাবর ভারতে বহিরাগত ছিলেন)। আর পঁয়ত্রিশ পুরুষ ধরে অযোধ্যায় রাজত্ব করে শ্রীরাম কীভাবে যাযাবরের বংশ হলেন, তাঁর কোন পূর্বপুরুষ যাযাবর বৃত্তি পালন করতেন তাও বোঝা গেল না। ▯

প্রতিপদে নিরুদ্ধ
নটিনী বিনোদিনী

(বিনোদিনী দাসী বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। বস্তুত তিনি না থাকলে বাঙ্গালির বড়ো গর্বের স্টার থিয়েটারে গড়ে উঠত কি না, তাতে সন্দেহ থেকেই যায়। অথচ বিনোদিনী ইতিহাসে উপেক্ষিতা। স্বস্তিকায় তিন পর্বে প্রকাশিত হবে বিনোদিনীর জীবন ও অভিনয় নিয়ে একটি বিশেষ নিবন্ধ। এই সংখ্যায় দ্বিতীয় পর্ব। —স্ব. স)

শেখর সেনগুপ্ত

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার সেই সময় তাদের পরবর্তী আকর্ষণ 'শত্রুসংহার' নাটকটি নিয়ে খুব ব্যস্ত। চলছে নিয়মিত রিহার্সাল, অবসরে নট-নটিনীদের মধ্যে কেবল খুনসুটি নয়, টিটকিরিও। পদস্থদের এমন মেজাজ যেন ওই সংস্থাটি তাঁদেরই বাপকেলে সম্পত্তি। নাট্যকারের নাম হরলাল রায়। তিনিও মাঝে মাঝে চলে আসেন মহড়ায়। গমগমে কণ্ঠস্বর। নাটকের বিষয় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। বেশি জটলা ও কচকচানি ভুবনমোহন অধিকারীর অপছন্দ। তাই মাঝে মাঝেই তিনি খেপে ওঠেন, শাসনও করেন।

বিনোদিনী কিন্তু ভুবনমোহনের প্রতি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। তাঁরই অনুগ্রহে তো তিনি এ রকম একটি দুনিয়ায় এসে হাজির হতে পেরেছেন, যদিও নাটকে বিনোদিনীর রোল দ্রৌপদীর এক নগণ্যা দাসীর।

'আমার অভিনেত্রী জীবন'-এ বিনোদিনী লিখেছেন, 'সেই আমার প্রথম মঞ্চে উঠে অভিনয়। ভূমিকা দ্রৌপদীর দাসীর। মাত্র দুই ছত্র কথা। মুখস্থ করেছি। খামখা ভয় পাবার কারণ কী? রিহার্সালে কামাই দেইনি একদিনও।..... তবুই নাটকের প্রথম দিনে যখন উইংসের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, আমার পা টলছে, কী বলব কীভাবে বলব, যেন ভুলে যাচ্ছি। পুঁটলির গেরো খুলতে গিয়ে কিছু ভুল না করে ফেলি।.... বাস্তবে কিন্তু উতরে গিয়েছিল বিনোদিনীর প্রথম মঞ্চাভিনয়।

নাট্যশালা দালানের অন্ধকোণে বসে ছিলেন বিনোদিনী। পরিচালক তাঁর মুখ থেকে আধা সিগারেটটাকে ফেলে দিয়ে ওর গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'ঘাবড়াস না, তোর হবে।' পরিচালক তাঁর কথা রেখেছিলেন ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। তাঁর পরিচালিত পরবর্তী নাটক 'হেমলতা'য় তিনি বিনোদিনীকে টেনে তুলে এনে বসালেন একেবারে নামভূমিকায়। ক্ষোভে, বিস্ময়ে অন্য অভিনেত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, কারোর আবার যেন তড়কা লাগে।

এই নাটকটিরও রচয়িতা হরলাল রায়। হেমলতার চরিত্রটি জটিল। ভারী ভারী গহনা দিয়ে মোড়া তাঁর শরীর। একবার অভিমান হলে ঘনিষ্ঠ পুরুষটির আর গতি নেই।

বয়স ও অভিজ্ঞতায় নবীনা হয়েও বিনোদিনী যে দক্ষতায় চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেন, তার বুঝি তুলনা হয় না। দর্শকরা যেন ক্ষেপে উঠলেন বার বার ওই নাটকটিকে দেখতে। মুখ্য আকর্ষণ অবশ্যই বিনোদিনীর অভিনয়। দর্শক সমাগমে সারা হলঘর যেন গমগম করতে থাকে। অন্য চার অভিনেত্রীর গরিমা ও পরিচিতিকে যেন ধূসর করে ছাড়লেন বিনোদিনী। একদিন দর্শকাসনে এসে বসেছিলেন বিনোদিনীর মা-ও। বাড়িতে ফিরে লম্ফ জ্বেলে কন্যাকে আদর করেছেন। সেই দিনগুলিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাও করতেন অমন গুণবতী, রূপবতী মেয়েকে চোখে চোখে আগলে রাখতে। যদিও বিনোদিনী বয়সের বিচারে তখনও যথার্থ 'সোমত্ত' হয়ে ওঠেননি, তবুও বহু পুরুষের বাসনাতে তখন তুষের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছাড়াও বিভিন্ন ছোটো-বড়ো শহর থেকে বরাত পেয়ে তাদের নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে, বিনোদিনীর সঙ্গে তাঁর মা-ও ঘুরছেন। সেই সুবাদে তাঁর দেখা হয়ে গেল অচেনা দিল্লি, আগ্রা, মথুরা, লাহোর, মীরাট,

লক্ষ্ণৌ.....। ব্যস্ততার মধ্যেও শান্তিময় দিন। অভাবের তাড়না নেই। অনুতাপ নেই। তার মেয়ের অভিনয়-খ্যাতি বাতাসে উড়ছে। আঙরাখায় শরীর ঢেকে সামান্য অবসরে ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে একটু বিশ্রামও নিচ্ছেন বিনোদিনী। আর জলচৌকিতে বসে থাকা অন্যান্য অভিনেত্রীরা ওঁর দিকে ঈর্ষাজর্জরিত নজরে তাকান। তখনকার ভারতব্যাপী নাট্যপরিক্রমায় বিনোদিনীর অসাধারণ অভিনয়ে ও গানে যে সমস্ত নাটক সমানে দর্শক টানছিল, সরগরম হয়ে উঠছিল প্রতিটি আসর, তাদের নাম 'শত্রুসংহার', 'হেমলতা', 'লীলাবতী', 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'নীলদর্পণ', 'সতীকলঙ্কিনী' ও 'নবীন তপস্বী'। অভিনয়ের টেক্কা-বিবি-গেলাম সবই বিনোদিনীর কাছে বিলকুল জলভাত। তেমনি গানের গলা। 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর কর্ণধার ভুবনমোহন অধিকারী স্বয়ং পায়চারি করেন এবং মাঝে মাঝে কাছে ডেকে নেন বিনোদিনীকে। বয়স ও পদমর্যাদার তফাত যে আকাশ-পাতাল, সেই বোধটুকুও তখন উধাও হয়ে যায় তাঁর। সেই সময়েই বিনোদিনীর জীবনে আবির্ভাব ঘটে লাহোরের কুবের গোপাল সিং-এর। বিনোদিনী তখন তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন। গোলাপ সিং একদিন ঘোড়ার গাড়িতে চেপে চলে এলেন অস্থায়ী নাট্যশিবিরে। সরাসরি প্রস্তাব দিলেন বিনোদিনীকে 'তোমাকে আমি আমার অন্তঃপুরের রানি করে রাখতে চাই। এর জন্য তোমার মা যত টাকাই দাবি করুন না কেন, আমি মিটিয়ে দেব।' সেই কামাসক্ত পুরুষের আকুলি-বিকুলি। বিনোদিনীর জন্ম যে পরিবারে, যে পরিবেশে সেখানে এধরনের শূন্যগর্ভ আবেদন অহরহ আসে-যায়। প্রকৃত প্রেমের অনুভব ও অনুতাপ দুই-ই শুকিয়ে যায়। গুটিকয়েক কৃষ্ণময়ী রাত্রি পার হলেই সব শেষ। এক টিলা থেকে অন্য টিলায় ঝাঁপ দেওয়া মাত্র। ঐশ্বর্যের স্বাদ নিতে না নিতেই শেষ। প্রকৃত প্রেম মানে দুস্তর পারাবার। সেই জিনিস বিনোদিনীর জীবনে আসেনি। আসব-আসব করেও স্থগিত থেকেছে বারবার।

সুতরাং গোলাপ সিংকে নিরাশ হতে হলো। বিনোদিনী তাঁর হারেমকে কিছুতেই আলোকিত করে তুলতে সম্মত হলেন না।

কলকাতায় ফিরে আসবার পর বিনোদিনী নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করলেন নতুন নাটক 'প্রকৃতবন্ধু'-তে। এই নাটকে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ আর. জি. করের অনুজ রাধানাথ কর। নাট্যমহড়াকালে তাঁদের দু'জনের মধ্যে এমন কোনও নৈকট্য গড়ে ওঠেনি, যাকে মর্ত্যলোকের ভাষায় আমরা 'প্রেম' আখ্যা দিতে পারি। বিনোদিনীর পরবর্তী নাটক 'মেঘনাদ বধ'। মেঘনাদ বধ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কলকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আড়ামোড়া ভেঙে থিয়েটার দেখতে ছুটে এসেছিলেন। নাটকটির কোথাও কোথাও যে দুর্বলতা ছিল অভিনয়ের জোরে বিনোদিনী সেই সকল ফাটলকে ঢেকে রাখতে পেরেছিলেন। প্রতিটি যুবা বয়সের অভিনেতা তাঁর ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছেন। তার সম্পর্ক কারোর সঙ্গেই বেশিদূর গড়ায়নি। আজ ভাবলে অবাক লাগে, ওই নাটকটিতে বিনোদিনী ঘুরেফিরে সাত-সাতটি বিভিন্ন নারী চরিত্রে অভিনয় করে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। চরিত্রগুলি হল সীতা, প্রমীলা, চিত্রাঙ্গদা, বারুণী, মায়া, মহামায়া ও রতি। প্রতিটি চরিত্রেই তিনি স্বচ্ছন্দ নির্ভয়। আড়ষ্টভাব তো তাঁর কোনও কালেই ছিল না। প্রতিটি নাটকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তিনিই পেয়েছেন। দর্শকরা মুহুর্মুহু হাততালি দিয়েছেন। আশ্বস্ত হয়েছেন নাটকের পরিচালক। অনেকে ক্যামেরা নিয়েও হলে ঢুকেছেন, তবে আইনে বাধা থাকায় স্নাপশট কেউ নিতে পারেননি। নটিনী বিনোদিনীর ফোটো তাই এক বিরল বস্তু।

১৮৭৬ সালে শরিকি বিবাদের জেরে বন্ধ হয়ে গেল 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। ভুবনমোহন অধিকারী নাটকের কারবার ছেড়ে দিয়ে শুরু করলেন ভেষজ দ্রব্যের বাণিজ্য। বিনোদিনীকে কিন্তু একটি দিনের জন্যও কর্মচ্যুত অবস্থায় থাকতে হয়নি।

বাঙ্গলায় তখন আরও একটি বড়ো নাট্যসংস্থা ছিল। নাম 'বেঙ্গল থিয়েটার'। ঠিকানা কলকাতার বিডন স্ট্রিট। 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর মালিক শরৎচন্দ্র ঘোষ একরকম ছোঁ মেরে তুলে নিলেন বিনোদিনীকে। সেখানে বিনোদিনীর বেতন স্থির হলো মাসিক পঁচিশ টাকা। শরৎচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ছাতুবাবু অর্থাৎ 'দেবসাহিত্য কুটির'-এর কর্ণধার আশুতোষ দেবের দৌহিত্র। বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবার পর বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন 'মৃণালিনী' নাটকের নাম ভূমিকায়। নাটকের প্রথম রজনীতেই যে ঘটনা ঘটে, বিনোদিনীর জীবনস্মৃতিতে তাকে কোনোক্রমেই হালকা করে দেখান যাবে না। সেই সন্ধ্যায় দর্শকাসনে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপকে জীবন্ত করে তুললেন মঞ্চে অনন্যা অভিনেত্রী বিনোদিনী। নাটক শেষ হলে সাহিত্যসম্রাট মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি মৃণালিনীকে পুস্তকের পৃষ্ঠাতেই আবদ্ধ রেখেছিলাম। কখনও যে তার জীবন্তরূপ প্রত্যক্ষ করতে পারব, আশা করিনি। আজ বিনোদিনীর অভিনয় দেখবার পর আমার সেই ভ্রম ঘুচল।'

যেন একই অনুভবে অভিভূত হয়ে

পড়েন ঠাকুরবাড়ির অন্যতম ব্যক্তিত্ব জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুরও। তাঁর রচিত দুটি নাটক 'অশ্রুমতী' ও 'সরোজিনী'তে কৃচ্ছসাধনে ক্লিষ্ট দুই নায়িকার ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। অতঃপর বিনোদিনীর সঙ্গে তিনি একাধিকবার দেখা করেন, নানা বিষয়ের আলোচনায় তাঁদের সময় কাটে। জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠাট্টা করে বিনোদিনীকে 'সরোজিনী' নামে ডাকতেন।

অভিনেত্রীরূপে বিনোদিনীর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু কিছু কেচ্ছাও লোকের কানে আসে। কিন্তু তখনও তাঁর পরিচয় হয়নি বাংলা নাট্যভুবনের মুকুটহীন সম্রাট গিরিশ ঘোষের সঙ্গে। সেটা বাস্তবায়িত হয় আরও বছর তিনেক বাদে। গিরিশ ঘোষের শ্বাসরোধকারী উদ্যমে ও প্রতিভার ঝলকানিতে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' তখন পুনরায় তার হৃতগৌরব ও প্রতিষ্ঠা ফিরে পাচ্ছে। গিরিশ ঘোষের সাহচর্যে আসতে বাংলা নাট্যভুবনের প্রায় সকল কুশীলবই দফায় দফায় চেষ্টা করে চলেছেন। বিনোদিনী ছিলেন বহুলাংশে ব্যতিক্রমী। কিন্তু গিরিশ ঘোষের কৌতূহল ছিল ওই অভিনেত্রীর প্রতি। তাঁর চেনাজানা তাবড় লোকদের কাছ থেকে বিনোদিনীর অনেক প্রশংসা তিনি শুনেছেন। কয়েকবার বিনোদিনীর অগোচরে মাননীয়দের আসনে বসে মেয়েটির অর্গলহীন অভিনয় দক্ষতার পরিচয় পেয়ে প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছেন। কিছুদিন পরে কাছে নেমে এসে বললেন, 'তোমার অভিনয় দক্ষতা জোরালো। তুমি ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিলে খুশি হব। ১৮৭৭ সালের ঘটনা। পরবর্তী তিন বছর গিরিশ ঘোষের ছায়ার তলায় থেকে বিনোদিনী নিজেকে আরও পরিশীলিত করে তোলেন। মাঝে মাঝে নাটকের চরিত্র নিয়ে তাঁদের আলোচনাপর্ব গড়াত বহুদূর।

গিরিশ ঘোষেরই রচিত ও পরিচালিত চল্লিশটি নাটকে বিনোদিনী অভিনয় করেছিলেন। সোজাকথা! নজির দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিটিতে নায়িকার ভূমিকায় বিনোদিনী। তাঁর আগে যাঁরা ওই নাটকগুলিতে নায়িকার রোলে প্লে করেছিলেন, দর্শকরা তাঁদের নামও যেন ভুলে যেতে থাকেন। বঞ্চিতরা যে দলবদ্ধভাবে আত্মজৈবনিক বিনোদিনীর পিছনে লাগবেন, সেই সাহসও তাঁদের ভাঁড়ারে ছিল না। কারণ, গিরিশ ঘোষকে চটিয়ে সেই সময়ে কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীর পক্ষে বাঙ্গলার কোনও নাট্যমঞ্চেই হালে পানি পাওয়া সম্ভব নয়। পথ-ঘাট, গাছ-গাছালি, ঘর-বাড়ির বহির্দেয়াল সর্বত্র চলছে বিনোদিনীকে নিয়ে প্রচার-পরিক্রমা।

১৮৮০ সালে নাট্যবাণিজ্যে লগ্নি করতে টাকার থলে হাতে হাজির হলেন এক মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী। নাম তার প্রতাপচাঁদ জহুরী। চোখের তলায় বয়সজনিত কালোছাপ থাকলেও হরেক কিসিমের ব্যবসায়ে তিনি টাকার কুমির। আলাপপর্বেই গিরিশ ঘোষ বুঝলেন, প্রৌঢ় জহুরী ধনসম্পদে কুবের হলেও নাটকের 'ন' বোঝেন না। এই কারবারের শিকড়বাকড়, কুশলীদের মর্মবেদনা, নাট্যকার ও পরিচালকের প্রতিভা ও দক্ষতা কিংবা সম্ভাব্য কারচুপি—কোনও বিষয়েই জহুরি আদৌ জহুরি নন। অন্যান্য অনেক ব্যবসায়ে অতীব ধুরন্ধর। কলকাতার বড়বাজারে জমকালো গদি। সেখানে বসে মাঝরাত্রির অবধি টাকা গোনেন এবং থেকে থেকে চিবুকের আঁচিল চুলকান।

বুদ্ধিমান গিরিশ ঘোষ এরকম লোকেরই লগ্নির প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি উৎসাহ দেখালেন। মালিকানা হস্তান্তরিত হলো। ফলে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' এর মুখ্য পরিচালক হয়েই থাকলেন গিরিশ ঘোষ। সেটাই ছিল বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অবাঞ্ছনীয় ঘটনাও ঘটতে থাকে। যেমন প্রতাপচাঁদ জহুরি যখন তখন এসে হানা দিতেন নাট্যশালায়। সেই সময়ে তাঁর আচার-আচরণ, মন্তব্য, উৎকট হাসি বিনোদিনীকে আঘাত করত। স্বল্পান্ধকারে একজন তরুণী অভিনেত্রীর সঙ্গে জহুরির দৈহিক ঘনিষ্ঠতা বিনোদিনীর নজরে আসে এবং এ সমস্তই তাঁর কাছে খুবই অবাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল। এক সময় তো ভেবেও ছিলেন, ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে এবার সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে অন্য কোনও নাট্যশালায় গিয়ে ভিড়বেন। গিরিশ ঘোষকে তিনি সব জানালেনও। নাট্যগুরু অবশ্য তাঁকে বোঝালেন, এই সব নিয়ে মাথা না ঘামাতে। আর বিনোদিনীর নিকট তো গিরিশ ঘোষ সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তাই ন্যাশনাল ছেড়ে তাঁর তখন বেরিয়ে আসা হলো না। তখন সেই সময়, যখন বিনোদিনীর ঠিকানা ছিল পূর্ববঙ্গের রংপুরে। এক জমিদারের বাড়িতে দু'খানা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। অবসরে নিজেকে অবহেলা না করে চলে যেতেন সেখানে। সেই জমিদারের তনয় বিশ্বরূপ পুলকিত হন বিনোদিনী ওখানে সময় কাটাতে এলে। নগণ্য যুবতী তো নন। দুনিয়ার মানুষ ধন্যে দেয় তাঁর অভিনয়ের। রূপ-যৌবনও নজর কাড়ে। কিন্তু যত নাম-ডাক, উপার্জন সেই তুলনায় অনেক কম। বাজারে গিয়ে বিনোদিনীর মা সস্তার ছোটোমাছ কেনেন; মুরগি কোন ছাড়, আন্ডাও ঢোকে না হেঁসেলে। বিশ্বরূপ তাঁর

মায়ের পইপই করে বলা বারণ সত্ত্বেও বিনোদিনীকে প্রস্তাব দেন জমিদার বাড়ির বউ হতে। তবে শর্ত একটা আছে—বিয়ের পর বিনোদিনী আর নাট্যশালার অভ্যন্তরে প্রবেশও করবেন না।

বিনোদিনী পত্রপাঠ বিশ্বরূপের প্রস্তাবকে খারিজ করে দিলেন। কেবল তাই নয়, জমিদারবাড়ি ছেড়ে দিয়ে মাকে নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতার আদি মহল্লায়।

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে ১৮৮২ সনে। প্রতাপচাঁদ জহুরী আয়-ব্যয়ের হিসেবনিকেশের অছিলায় প্রায়ই এসে হানা দিতেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ। ভুরু নাচিয়ে কথা বলতেন। অভিনেত্রীদের দিকে ছিল তাঁর শকুনের চোখ। গিরিশ ঘোষের আর এসমস্ত সহ্য হচ্ছিল না। তাঁদের দু'জনের মধ্যকার মনোমালিন্য তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। নাটক সম্পর্কে সামান্যতম জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও প্রতাপচাঁদ জহুরী যেভাবে সব বিষয়ে মাতব্বরি করে বেড়ান, তাতে গিরিশ ঘোষের হেলদোল থাকবে না, তা কখনও হয়? গিরিশ ঘোষ রুখে দাঁড়ালেন। সে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম।

গিরিশ ঘোষের পিছনে তখন একে একে এসে দাঁড়ালেন বিনোদিনী সমেত সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী। তাঁরা একযোগে গিরিশ ঘোষের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ছেড়ে বেরিয়ে এলেন পথে। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে স্মরণে এনে গিরিশ ঘোষ সেদিন বলেছিলেন, আমরা সবাই হিন্দু। আর ঠাকুর আমাকে শিখিয়েছেন, কীভাবে সততার সঙ্গে মহা অনিশ্চয়তাকেও জয় করা যায়। আসুন, আমরা এক হয়ে কেল্লাফতের নিদর্শন গড়ে তুলি। যাঁরা কেবল টাকা চেনেন, সেই মক্কেলদের আমরা উপযুক্ত শিক্ষা দেব নাটকের মাধ্যমেই।'

গিরিশ ঘোষের নেতৃত্বে সকল মঞ্চসফল অভিনেতা-অভিনেত্রী সেদিন শপথ নিলেন যে অতঃপর তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করে নিজেরাই একটি থিয়েটার হল নির্মাণ করবেন কলকাতাতেই। সকলকে সংগঠিত করবার পিছনে বিনোদিনীর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে সেটা এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকমুখ। বহুজনের টনক নড়ে। যাঁরা অভিনয় করেন, যাঁরা নাটক লেখেন, যাঁরা নাটকের পরিচালনা করেন, সর্বোপরি যাঁরা নাটক দেখতে ভালবাসেন, তাঁরা সকলে মিলে যেন হাপরের শিকলে টান লাগাতে বসে গেলেন। কিন্তু একটি আস্ত থিয়েটার হল নির্মাণ তো মুখের কথা নয়। বহু টাকার দরকার। টাকার একটা হিসেব করবার পর তাঁদের মুখ শুকিয়ে যায়। একজন অন্য জনের গা টেপাটেপি করে উঠে যান একে একে। শেষ অবধি থাকলেন কেবল দু'জন--- স্বয়ং গিরিশ ঘোষ এবং তাঁর অনুগামিনী বিনোদিনী। গিরিশ ঘোষকে প্রণাম করে হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বিনোদিনী। অনেক যত্নে নিজের কায়িকরূপকে আরও আকর্ষক করে তুললেন। তারপর সাহায্যের আবেদন জানাতে শুরু করলেন সেই সমস্ত ধনী ব্যক্তিদের নিকট, যাঁরা এক বা একাধিকবার বিনোদিনীর কাছে এসেছিলেন তাঁর যৌবনের ক্ষীরকে উপভোগ করতে। অনেকেই সাহায্য করলেন, চৌকস বিনোদিনীকে খালি হাতে ফেরান কঠিন। সবচেয়ে বড়ো সাড়া সেদিন বিনোদিনী পেয়েছিলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্যতম রত্ন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। বিনোদিনীর হাতে তিনি পুরো তিন হাজার টাকা তুলে দিয়েছিলেন সেদিন। সেই যুগের বিচারে তা এক বিপুল অঙ্কের টাকা! বিনোদিনীর গমনপথের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

কিন্তু দরকার যে আরও অনেক টাকার। শুধু তত্বকথার আরোহণ অবরোহণের ব্যাপার নয়। প্রতিরাতে সংগৃহীত দান ও ভিক্ষার হিসেব নিয়ে বসেন বিনোদিনী যে কাজে কোনও নান্দনিক ব্যঞ্জনা থাকে না। হয়তো আবার নামতে হবে সেই নোংরামিতে, যেহেতু কলকাতায় নারীদেহলোভী বিকারগ্রস্ত ধনীদের সংখ্যা পর্যাপ্ত। প্রতিদিন গিরিশ ঘোষ বিনোদিনীর কাছ থেকে টাকা নেন এবং এই অভিনেত্রীর প্রতি গাঢ় স্নেহে তাঁর হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে থাকে। ওই সময়ে বিনোদিনী যে সমস্ত কামুক ধনীদের সঙ্গে দিনের বা রাতের একাংশ কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গুরুমুখ মুসাদ্দি। এই লোকটির আদি বাড়ি রাজস্থানের জয়পুরে। কলকাতায় এসে হরেক রকমের ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে ওঠেন। বিনোদিনীকে কাছে পাবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ। প্রতিবার মিলিত হবার আগে কয়েক মুঠো নোট তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নিতেন বিনোদিনী। গুরুমুখ হল নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় বহন করবেন; পরিবর্তে বিনোদিনীকে তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে কেবলমাত্র গুরুমুখ মুসাদ্দির রক্ষিতা হয়ে থাকতে হবে। বিনোদিনী সেই প্রস্তাবকে নাকচ করে দেন। 'আমার কথা'-য় বিনোদিনী লিখেছেন, অনেক সাহসের ওপর নির্ভর করিয়া আমি অর্থ সংগ্রহের জন্য বহু নীচে নামিয়া ছিলাম ঠিকই, কিন্তু তাই বলিয়া ওইরূপ শর্ত মানিতে সম্মত হইতে পারি নাই। (ক্রমশ...)

সুকমাবতী সুকর্ণপুত্রীর হিন্দু ধর্ম গ্রহণ

ধীরেন দেবনাথ

সারবিশ্বে যখন ভীতি বা শক্তি প্রয়োগ পূর্বক বিভিন্ন ধর্ম বা মতের মানুষকে ইসলামে দীক্ষিতকরণের কাজ চলছে বা চলে আসছে, তখন ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছে একটি উলটো খবর। খবরটি চাঞ্চল্যকর। আর সেটি হচ্ছে, ইন্দোনেশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি তথা বিশ্বখ্যাত রাষ্ট্রনেতা সুকর্ণর তৃতীয় কন্যা সুকমাবতী সুকর্ণপুত্রীর ইসলাম ত্যাগ করে সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ। তাঁর বয়স এখন ৭০ বছর। তিনি আবার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মেঘাবতী সুকর্ণপুত্রীর বোন। খবরে প্রকাশ, ২৬ অক্টোবর মঙ্গলবার পূর্বনির্ধারিত সুকর্ণ হেরিটেজ এরিয়ায় অনুষ্ঠিত একটি পূজানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন তিনি। তবে সুকমাবতীর ইসলাম ত্যাগের কারণ একাধিক। যদিও তিনি মুখে বলেছেন তাঁর ঠাকুরমার ধর্মের কথা, যিনি ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। ঘটনা হচ্ছে, সুকমাবতী একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। আর তাই নিয়ে কট্টর সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা ও তাদের ইসলামিক সংগঠন তাঁর বিরুদ্ধে তুলেছিল ইসলাম ধর্ম অবমাননার অভিযোগ। যদিও তিনি তাঁর কবিতার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। তবুও তাঁকে নিয়ে বিতর্ক-সমালোচনা থামেনি। সম্ভবত নিজ ধর্মের দিক থেকে আসা আঘাত তাঁকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করেছে। তাছাড়া তাঁর পিতামাতার বিচ্ছেদ (১৯৮৪) তাঁকে হয়তো মানসিক ও নৈতিক ভাবেও বিপর্যস্ত করেছে। তবে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনাও ছিল। তাই তাঁর হিন্দু ধর্মে আসা। আর এই ঐতিহাসিক ঘটনা যে গৌরবোজ্জ্বল, মানবতাবাদী ও শান্তিকামী হিন্দু ধর্ম এং সংস্কৃতির সর্বজনীনতাই প্রকাশ করে তা বলাই বাহুল্য।

বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলমান প্রধান দেশ হলেও ইন্দোনেশিয়া ইসলামিক দেশ নয়। প্রায় ২৭ কোটি জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশই মুসলিম। হিন্দুর সংখ্যা প্রায় এক কোটি। আছে কয়েক লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীও। ইন্দোনেশিয়া মূলত হিন্দু এশিয়া বা হিন্দোনেশিয়া। ইন্দো শব্দটি হিন্দু শব্দের অপভ্রংশ। তাই ইন্দ, হিন্দ ও হিন্দু সমার্থক। অনুরূপভাবে ইন্দোচীন মানে হিন্দুচীন— যার বর্তমান নাম ভিয়েতনাম। আর কম্বোজ বর্তমান কম্বোডিয়া। এটিও ছিল একদা হিন্দুরাজ্য। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এক ভারতীয়— কৌন্ডিন্য। রাজ্যে ছিল শৈবধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার প্রচলন। এছাড়া হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ছিল পীঠস্থান। এই বংশের রাজা সূর্যবর্মণ বিশ্বখ্যাত আঙ্কোরভাট বিষ্ণুমন্দিরটি নির্মাণ করান। ইতিহাস বলছে, প্রাচীনকালে (দ্বিতীয় শতক) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা, জাভা, বালি, বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপগুলির নাম দিয়েছিল ভারতীয়রা 'সুবর্ণভূমি'। তাম্রলিপ্ত (তমলুক), কন্যা কুমারিকা-সহ বহু বন্দর থেকে ভারতীয় বণিকরা সুবর্ণভূমির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত। আর সেই সূত্রে এই অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং বিস্তার লাভ করে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ভারতীয় কিছু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ফলে সুবর্ণভূমিতে ভারতীয় হিন্দুধর্ম বিশেষত শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করে। কম্বোজের পুবদিকে চম্পা নামে ছিল একটি হিন্দু রাজ্য। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই রাজ্য স্থায়ী ছিল। রাজ্যে ছিল বহু হিন্দু মন্দির। শিবের উপাসনা ছিল জনপ্রিয়। সংস্কৃত ভাষায় চলত রাজকার্য। অষ্টম খ্রিস্টাব্দে মালয়, সুমাত্রা, জাভাও ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা শৈলেন্দ্র বংশের অধীন এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য। শৈলেন্দ্র রাজাদের সঙ্গে ছিল বাঙ্গলার সম্পর্ক। বরবদুরের প্রসিদ্ধ স্তূপ শৈলেন্দ্র বংশের শিল্প কীর্তি। পাহাড়ের উপর নির্মিত এই স্তূপাকার মন্দিরের গায়ে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি খোদাই করা হয়েছে। এটি বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য বলে খ্যাত। এখানে তারাদেবীর একটি সুবিখ্যাত মন্দিরও নির্মিত হয়েছে। তবে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ই ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে আজও।

কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমান আগমন ঘটে। তারা উত্তরের সুমাত্রা থেকে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বৃদ্ধি পেতে থাকে ইসলামের প্রভাব। তবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল অক্ষুণ্ণ। কোনো ধর্মই অন্য কোনো ধর্মের পথে বাধা সৃষ্টি করেনি। সব মানুষই নিজ নিজ ধর্মীয় উৎসব পালন করত নির্বিঘ্নে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল অতুলনীয়। আর সেই সুবাদে ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সহিষ্ণুতার দেশ রূপে গণ্য। ১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে শৈলেন্দ্র বংশের শেষ রাজা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। কালক্রমে সুমাত্রা, জাভা ও মালয়ে ইসলাম প্রসার লাভ করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান ধর্ম হয় ইসলাম। কাফেররা বধযোগ্য। হালে তালিবানরা তা দেখাচ্ছেও করে।

বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান জেহাদি বর্বরতা যখন অব্যাহত, তখন সুকমাবতীর সহিংস ইসলামধর্ম ত্যাগ করে অহিংস, শান্তি, মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্বের ধর্ম সনাতন হিন্দু ধর্ম গ্রহণ নিঃসন্দেহে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাছাড়া সুকমাবতীর শরীরেও তো বইছে হিন্দু ঠাকুরমার রক্ত! আর এ সবই হিন্দু ধর্মের সর্বজনীন মহানুভবতার প্রমাণ। □

জুঁই ও মোমো

কলকাতা স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তেই মোমোর মনটা ভালো হয়ে গেল। ট্রেনের মধ্যেই সে লাফাতে লাগল। বাবা ধমকে উঠল। কী করছ মোমো, ট্রেনের মধ্যে কেউ লাফায়! – আমার তো খুব মজা হচ্ছে। ঠাম্মার কাছে যাচ্ছি। কত মজা হচ্ছে যে আমার সে তুমি বুঝবে না, বলল মোমো। মোমোর কথা শুনে তার মা আর ট্রেনের কামরার কয়েকজন হেসে উঠল। ধীরে ধীরে ট্রেন অনেক স্টেশন পেরিয়ে বর্ধমান জংশনে এসে পৌঁছল। মোমোর আর আনন্দ ধরে না। আর একটুখানি রাস্তা। তারপরই ঠাম্মা, জেঠুমণি, জেম্মা আর দিদিভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে। মোমো ভাবছে ঠাম্মার বাড়ি ঢুকলেই একটা দারুণ সুগন্ধ নাক এসে ঢুকবে। সেটা আর কিছুই নয়, ঠাম্মার হাতে গড়া বাগানের ফুলের সুগন্ধ। এবারও তাই হবে।

মোমো মনের আনন্দ লাফাতে লাফাতে বাড়ি ঢুকল। বড়ো দরজার সামনে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। দিদিভাই একছুটে এসে মোমেকে কোলে তুলে নিল। এর কোলে ওর কোলে ঘুরতে ঘুরতে মোমোর মনে হলো আরে সেই গন্ধটা নেই তো! – ও ঠাম্মা, আমি বাগানে যাব। –যাবেই তো দাদুভাই, চলো তোমাকে বাগনে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি, বলল কাশিকাকা। কাশিকাশি এ বাড়িতে অনেকদিন আছে। ঠাম্মার নানান কাজকর্ম করে দেয় আর বাগান দেখাশোনা করে। কী নেই সেই বাগানে। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচুর গাছ আর হরেক রকমের ফুল। বিভিন্ন উৎসব পার্বণে গ্রামের সবাই ঠাম্মার কাছ থেকে ফুল নিয়ে যায়। বাগানে একটা পুকুর আছে। পদ্ম ফোটে। হাঁস ঘুরে বেড়ায়।

বাগানে পা দিয়েই মোমোর মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। সেই গন্ধটা তো নেই-ই, উপরন্তু গাছগুলো কেমন যেন নুয়ে পড়েছে। – কাশিকাকা, কী অবস্থা বাগানের। এমন হলো কীকরে? -- ঠিক জানি না খোকাবাবু, আমি তো যত্ন করি। তবু কয়েক মাস থেকে বাগানের এমন অবস্থা, বললে কাশিকাকা। মোমো দেখল পেছনে ঠাম্মা দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা দুঃখ দুঃখ আর চোখে জল ভর্তি। ছুটে গিয়ে ঠাম্মাকে জড়িয়ে ধরল আর বলল, তুমি কষ্ট পেও না ঠাম্মা। আমি এসে গেছি, দেখবে বাগানে আবার ফুল ফুটবে। –তাহলে আমি খুব আনন্দ পাব। কিন্তু

তুমি পারবে কীকরে দাদুভাই, তুমি তো খুব ছোট্ট। – দেখো না আমি সব ঠিক করে দেব, বলল মোমো।

সারাদিন খেলে, ঘুমিয়ে, ছোটাছুটি করেই কেটে গেল মোমোর। কিন্তু মাথায় ঘুরতে লাগল কী করবে! রাতেরবেলায় মোমো ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাম্মা ও দিদিভাইও ঘুমে কাদা। মোমো ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে দরজাটা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একাই বাগানে চলে এল। ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। এ গাছ, সে গাছের কাছে ঘুরে, পুকুরের ধারে যায়। একসময় বুঝতে পারে তার পেছনে পেছনে কেউ ঘুরছে কিন্তু তাকে সে দেখতে পাচ্ছে না। মোমো পেছনে ফিরে বলল, যে আছ আমার সামনে এসে দাঁড়াও, – আমায় চিনতে পারছ মোমো? – খুব চেনা চেনা লাগছে কিন্তু বুঝতে পারছি না। তোমার নাম কী? বলল মোমো। –আমি জুঁইপরি। আমি বহুবছর তোমাদের বাগানে থাকি। আমার জন্যই তো এত ফুল ফোটে আর ফল ধরে বাগানে। আমি কাশিকাকাকে সাহায্য করি। কিন্তু কয়েক মাস আগে রাতের একটি তারা খসে পড়েছে, তাই আমাকে চলে যেতে হবে, কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাই কী করে? তাই তো বাগানের সব ফুল শুকিয়ে গেছে আর ফলও ধরেনি। পুকুরের জল আমার চলে যাওয়ার দুঃখে শুকিয়ে গেছে, হাঁসেরা পুকুর ছেড়ে চলে গেছে, বলল জুঁইপরি। মোমো কাঁদছে। না, তুমি যাবে না। তোমাকে আমি জন্ম থেকে দেখছি। – যদি একান্তই চাও তাহলে ভগবানের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করো, নাহলে এই বাগান শুকিয়েই যাবে, বলল জুঁইপরি। –আমি প্রার্থনাই করবো। আমায় সুযোগ দাও। এই বাগান নষ্ট হলে ঠাম্মা খুব কষ্ট পাবে। সে কষ্ট আমি চোখে দেখতে পারব না। বাগানে বসেই মোমো কাঁদতে লাগল আর প্রার্থনা করতে শুরু করল। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম ভাঙতেই সে দেখল সে কাশিকাকার কোলে। চারিদিকে সবাই দাঁড়িয়ে। মাথার কাছে ঠাম্মা। বললেন, তোমার কথা ভগবান শুনেছেন। মোমো চেয়ে দেখে চারিদিকে। বাগান কেমন ভরে উঠেছে ফুলে-ফলে। হাঁসেরা ফিরে এসেছে। পুকুর ভরে উঠেছে জলে। মোমো ভাবতেই পারছে না এই ম্যাজিক হলো কী করে। জুঁইপরি তাহলে থেকে গেল! —আমি জানি তুমি কী ভাবছ মোমো। আমরা সবাই জুঁইপরির কথা জানি। সবাই আমরা গত কয়েকদিন ধরে প্রার্থনা করেছি। গতকাল তোমরা আসার পর তোমার বাবা-মাকেও বলেছি। তারাও রাতে শোবার সময় প্রার্থনা করেছে। কিন্তু আমি জানতাম না যে তুমিও জানো সেই জুঁইপরির কথা, বলল জেঠুমণি। আসল কথা কী জান, ভালো কোনো কাজের জন্য পরিবারের সবাইকে এক সঙ্গে প্রার্থনা করতে হয়, তবেই সেটা ফলে, বলল ঠাম্মা। তাই কাল রাতে তুমিও যখন জুঁইপরির জন্য প্রার্থনা করলে ভগবান তা শুনেছেন।

মোমের আজ খুব আনন্দ। কারণ ফুলে-ফলে ভরা এই বাগানে আজ চড়ুইভাতি হবে। তারই তোড়জোড় চলছে। মোমা শুধু জুঁইপরিকে আরও একবার দেখতে চাইল আর অনেক ধন্যবাদ দিতে চাইল। মোমো জানে রাতেরবেলা জুঁইপরি ঠিক আসবে।

@স. ব

ভারতের বিপ্লবী

তারাদাস ভট্টাচার্য

ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে হাতেখড়ি। প্রথমে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে কাজ করেন। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বদানে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে তিনি কারারুদ্ধ হন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরপরই নেপালে রানাশাহির বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হলে সেখানকার বিপ্লবীরা বাঙ্গলার বিপ্লবী সংগঠনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালে তিনি নেপালে যান। ১৯৫০ সালের ১৫ ডিসেম্বর সেখানেই বোমা তৈরি করার সময় দুর্ভাগ্যবশত বিস্ফোরণ ঘটে এবং তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি?

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁদের কার্যকাল

১) জওহরলাল নেহরু ১৫ আগস্ট ১৯৪৭—১৯৬৪।
২) গুলজারিলাল নন্দা ২৭ মে— ৯ জুন ১৯৬৪।
৩) লালবাহাদুর শাস্ত্রী ১৯৬৪--১৯৬৬।
৪) গুজারিলাল নন্দা ১৯৬৬, ১৩ দিন।
৫) ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৬—১৯৭৭।
৬) মোরারজী দেশাই—১৯৭৭-১৯৮৯।
৭) চরণ সিং ১৯৭৯—১৯৮০।
৮) ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮০—১৯৮৪

ভালো কথা

আমার পরিশ্রম

আমি তৃতীয় শ্রেণীতে উঠার পর মা বললেন তোমাকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে পঞ্চমশ্রেণীতে ভর্তি করাতে চাই, সেইভাবে তোমাকে তৈরি হতে হবে। তারজন্য খুব পরিশ্রম করতে হবে। আমারও আনন্দ হয়েছিল যে আমি একটি ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাবো। তারপর দু'বছরের কঠোর পরিশ্রম আর চেষ্টায় আমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সুযোগ পেয়েছি। মা বললেন এসব ঠাকুর, মা আর স্বামীজীর আশীর্বাদেই সম্ভব হয়েছে। আমি মনে করি এর পেছনে আমার বাবা-মাও আছেন। মা আমার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করেছেন। রেজাল্ট বেরুবার দিন মা আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। আমিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছিলাম। সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পাওয়ায় আমার দিদা, মামা সবাই খুব খুশি হয়েছেন। ইন্টাভিউ দিতে গিয়ে ওখানকার সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার জীবনের এই সাফল্য খুবই আনন্দের। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আমি যেন মানুষ হতে পারি।

উদিত দত্ত, পঞ্চম শ্রেণী, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) অ ত জ্ঞা রি প য়	(১) হ নি স্ত র্মি ত
(২) লা ং প নে থ্য স	(২) স মৃ ব জ্ঞী ত নী

(২২ নভেম্বর শব্দের খেলা সামান্য ভুল থাকার জন্য দুঃখিত)

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

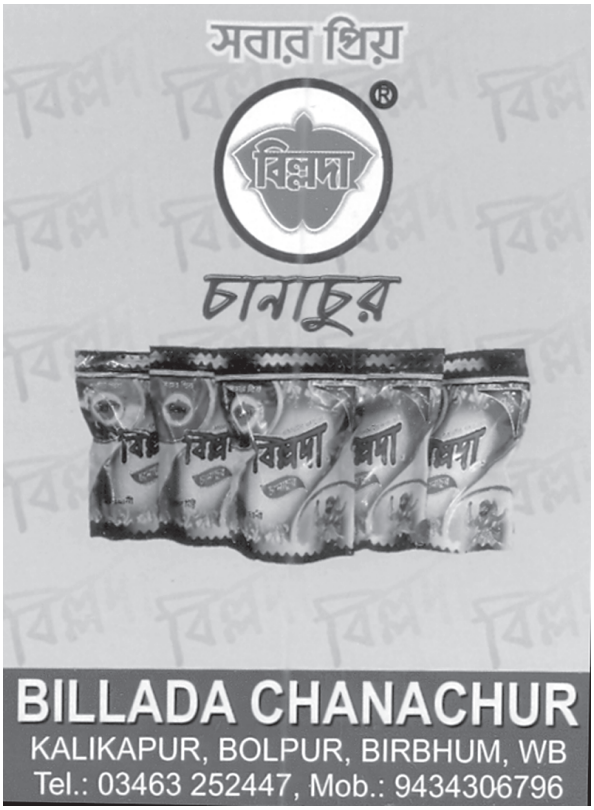

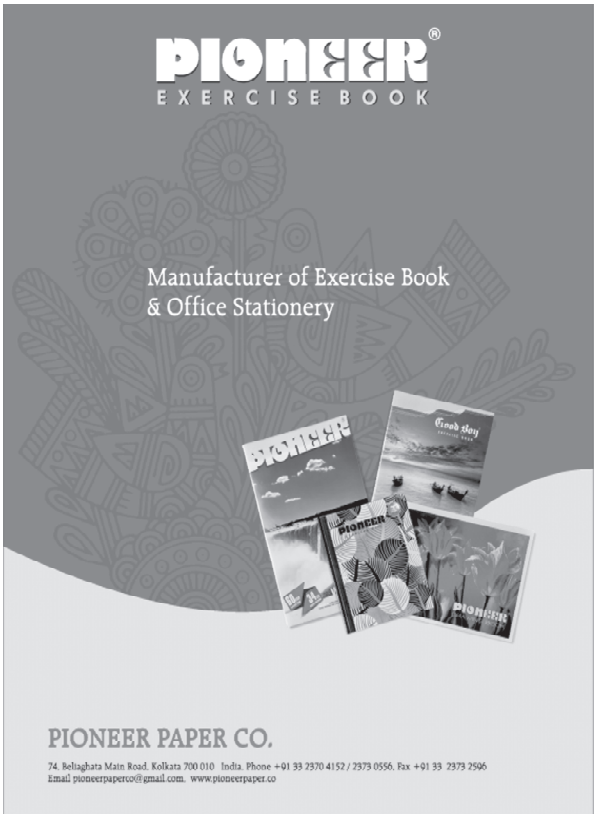

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে চাই নতুন নীতি প্রণয়ন

আনন্দ দেবশর্মা

বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে প্রথামাফিক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত নাগপুরে রেশমিবাগের মাঠে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বলেন, দেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নিকট ভবিষ্যতে অনেক সমস্যা তৈরি হবে। তিনি এনিয়ে যথাযথ চিন্তাভাবনা করার জন্যও বলেন। তিনি বলেন ২০১৫ সালে রাঁচিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল বৈঠকে এ নিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল। এখন আমরা দেখে নেব এই প্রস্তাবনায় কী রয়েছে। দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে গত দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম হয়েছে।

এ বিষয়ে অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডলের বক্তব্য হলো যে, ২০১১ সালের ধর্মীয় ভিত্তিতে জনগণনার বিশ্লেষণ থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাতে যে পরিবর্তন হয়েছে তা লক্ষ্য রেখে জনসংখ্যানীতির পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে অনেক বেশি মাত্রায় ফারাক, অনবরত বিদেশি অনুপ্রবেশ ও ধর্মান্তরকরণের কারণে দেশের মোট জনসংখ্যা বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকার জনসংখ্যার অনুপাতে ভারসাম্যহীনতা, ফলে দেশের একতা, অখণ্ডতা ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির পক্ষে তা গভীর সংকটের কারণ হতে পারে। বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে ভারত ১৯৫২ সালেই পরিবার পরিকল্পনা নীতি গ্রহণ করে।

কিন্তু ২০০০ সালে সর্বাঙ্গীণ জনসংখ্যানীতি নির্মাণ ও জনসংখ্যা কমিশন গঠন করেছিল। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল ২০৮০ সালের মধ্যে মোট জন্মহার (টিএফআর) ২১-এর আদর্শ স্থিতিতে পৌঁছে স্থির ও সুস্থ জনসংখ্যার লক্ষ্য অর্জন করা। আশা ছিল যে, জাতীয় সম্পদ ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনকে মাথায় রেখে জন্মহারের এই লক্ষ্য সমাজের সমস্ত শ্রেণীর জন্য কার্যকরী হবে। কিন্তু ২০০৫-২০০৬-এর রাষ্ট্রীয় প্রজনন ও স্বাস্থ্য সমীক্ষা (ন্যাশনাল ফার্টিলিটি অ্যান্ড হেলথ সার্ভে) এবং ২০১১ সালের জনগণনার ০-৬ আয়ুর ধর্মীয় ভিত্তিতে পাওয়া পরিসংখ্যান থেকে মোট জন্মহারে 'অসমতা এবং শিশু জনসংখ্যা অনুপাতের সংকেত পাওয়া যায়। এটা এই তথ্য থেকেই প্রকাশ হয় যে, ১৯৫১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে পর্যাপ্ত ফারাকের কারণে দেশের জনসংখ্যায় ভারতে উদ্ভূত মত-পথের মানুষের অনুপাত ৮৮ শতাংশ থেকে কমে যেখানে ৮৪.৪ শতাংশ হয়েছে, সেখানে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত ৯.৮ থেকে বেড়ে ১৪.২৩ শতাংশ হয়েছে।

এছাড়া দেশের সীমান্তবর্তী রাজ্য যেমন অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড় থেকে অনেক বেশি, যা পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশ থেকে অনবরত অনুপ্রবেশের সংকেত দেয়। মহামান্য সর্বোচ্চ আদালতের নিযুক্ত উপমন্যু হাজারিকা কমিশনের প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সময়ে আসা আদালতের রায়ও এই তথ্য পরিপুষ্ট করছে। এটাও একটা সত্যকথা যে, অবৈধ অনুপ্রবেশ রাজ্যের অধিবাসীদের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে এবং এইসব রাজ্যের সীমিত সম্পদের ওপর বোঝাস্বরূপ হয়ে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক চাপের কারণ হয়ে উঠছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ধর্মীয় জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা আরও সংকটের আকার ধারণ করেছে। অরুণাচলপ্রদেশে ভারতে উদ্ভূত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ যেখানে ১৯৫১ সালে ৯৯.২১ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০০১-এ ৮১ ও ২০১১ সালে ৬৭ শতাংশ হয়ে গিয়েছে। কেবল এক দশকেই অরুণাচল প্রদেশে খ্রিস্টান জনসংখ্যা ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। এরকম মণিপুরের জনসংখ্যায় ভারতে উদ্ভূত এই অনুপাত ১৯৫১ সালে যেখানে ৮০

সীমান্তবর্তী রাজ্য যেমন অসম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের জেলাগুলিতে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জাতীয় গড় থেকে অনেক বেশি, যা পরিষ্কারভাবে বাংলাদেশ থেকে অনবরত অনুপ্রবেশের সংকেত দেয়।

শতাংশের বেশি ছিল, তা ২০১১ সালের জনগণনায় ৫০ শতাংশ রয়ে গিয়েছে। উপরোক্ত উদাহরণ এবং দেশের বহু জেলায় খ্রিস্টানদের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির হার দেশবিরোধী শক্তির সংগঠিত ও পূর্বপরিকল্পিত ধর্মান্তরকরণের মতো কাজেরই সংকেত দিচ্ছে। অখিল ভারতীয় কার্যকরীমণ্ডল জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত ভারসাম্যহীনতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারের নিকট আবেদন করেছিল :

(১) দেশের সম্পদ, ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা এবং জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতার সমস্যাকে মাথায় রেখে দেশের জনসংখ্যা নীতির পুনর্বিবেচনা করে সবার প্রতি সমানভাবে কার্যকরী করা হোক।

(২) অবৈধ অনুপ্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হোক। জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ চালু করে অনুপ্রবেশকারীদের নাগরিক অধিকার ও জমিক্রয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হোক।

পরিশেষে, অখিল ভারতীয় কার্যকারী মণ্ডল স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশবাসীকে আহ্বান করেছিল যে, তারা নিজেদের কর্তব্য মনে করে জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতার কারণগুলিকে চিহ্নিত করে জনজাগরণের মাধ্যমে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিধিবদ্ধ প্রয়াস করার। সরসঙ্ঘচালক বিজয়া দশমীর বক্তৃতায় সেই একই কথা আবার স্মরণ করে দেন দেশবাসীকে তথা দেশের নির্বাচিত সরকারকে। □

ফঃ ৬

জোতদারের লাভ, চাষির ক্ষতি

কৃষি বিল বাতিল হওয়ার ফলে একদিকে যেমন পঞ্জাবের জোতদারদের লাভ হলো তেমনই ক্ষতি হলো পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রের।

দীপ্তাস্য যশ

কৃষি বিল প্রত্যাহার হলো। নরেন্দ্র মোদীর বিরোধীরা উল্লসিত। 'কৃষক নেতারা' আবার নতুন করে কোমর বাঁধছেন ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপিকে আইনে পরিণত করার জন্য। কিন্তু এসবের মাঝেই যে প্রশ্ন উঁকি দেয় তা হলো কৃষি বিল প্রত্যাহারে লাভ কার হলো? বিল প্রত্যাহারের রাজনীতি বাদ দিয়ে এই উত্তরগুলি খোঁজাও জরুরি। যাতে আমরা বুঝতে পারি আগামীদিনে আমাদের কৃষি অর্থনীতি কোন দিশায় যেতে পারে। এই উত্তর খোঁজার জন্য একদিকে আমরা নানাবিধ অর্থনৈতিক তত্ত্বের সাহায্য নিতে পারি, আবার বাজারের মাধ্যমেও ব্যাখ্যা করতে পারি। তবে আমি যেহেতু অর্থনীতিবিদ নই, একটি চাষি পরিবারের ছেলে, যে এই কৃষি বাজারে উৎপাদিত ফসলের দামের ওঠানামার সঙ্গে যুক্ত—তাই সেই অবস্থান থেকে আমি বাজারের মাধ্যমেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। আর সেই সঙ্গে চেষ্টা করবো পশ্চিমবঙ্গ ও পঞ্জাবের কৃষির কিছু তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরতে। তাহলে হয়তো লাভ-ক্ষতির অঙ্কের মাধ্যমে কার লাভ, কার ক্ষতি এই প্রশ্নটির উত্তর পেতে পারি।

কৃষি বাজারকে ব্যাখ্যা করার জন্য উদাহরণ হিসাবে চেষ্টা করব আলুর দামের একটি চিত্র তুলে ধরার।

বর্তমানে যে আলু বাজারে বিক্রি হচ্ছে তা মাঠ থেকে কোল্ড স্টোরেজে ঢোকানো হয়েছে এই বছরের মার্চ মাস নাগাদ। সেই সময় চাষের সমস্ত খরচ ধরে উৎপাদিত আলুর দাম পড়েছে প্রতি কেজি ১১ টাকা। অন্যান্য বছর যে আলু বীজ ১৫০০-১৬০০ টাকায় কেনা হয়, গত বছর সেই আলু বীজেরই দাম পড়েছিল ৪৫০০-৫০০০ টাকা। এই আলু বীজের পুরোটাই আসে পঞ্জাব থেকে। আলু উৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক হলেও এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গের কোনও সরকার স্থানীয়ভাবে উচ্চফলনশীল আলুবীজ চাষির হাতে তুলে দিতে পারেনি, একাধিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও। ফলে যে পঞ্জাবি ব্যবসায়ীরা আলুর বীজ বেচেছেন তারা আন্দোলনের খরচ পশ্চিমবঙ্গের চাষিদের ঘাড় ভেঙেই তুলেছিলেন। সেই কারণেই এই অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি। প্রতি বিঘাতে প্রায় চার বস্তা বীজ আলু লাগে। তার সঙ্গে সার, ওষুধ, মজুরি এবং অন্যান্য খরচ ধরে কৃষকের উৎপাদন খরচ পড়েছিল প্রায় ১১ টাকা প্রতি কেজি। স্বাভাবিক ভাবেই এবার যদি কৃষককে লাভ করতে হয় তাহলে প্রতি কেজি অন্তত ১৪ টাকায় বেচতে হয়। এবছর আলুর অত্যাধিক ফলন হয়েছে। সরকারি হিসাবেই বিভিন্ন কোল্ড স্টোরেজে প্রায় নয় কোটি বস্তা আলু ছিল। প্রকৃত হিসাব আরও বেশি। খুব স্বাভাবিক ভাবেই যে কোনো পণ্য বাজারে সুলভে পাওয়া গেলে তার বাজারদর কমবে।

কৃষক যখন বাজারের জন্য কোল্ড স্টোরেজ থেকে আলু ছাড়ল তখন সে দাম পাচ্ছে কেজি প্রতি পাঁচ থেকে ছয় টাকা। অর্থাৎ লাভ তো দূরের কথা, লোকসানের বহরই সামলানো দায়। অথচ এই আলুই খুচরো বাজারে বিক্রি হচ্ছে কুড়ি টাকা প্রতি কেজি দরে। কোল্ড স্টোরেজ থেকে আলু বার করার পর, তার প্রসেসিং কস্ট, পরিবহণের খরচ এবং অন্যান্য খরচ ধরে শহরের বাজারে পৌঁছাতে কোনওভাবেই খরচ ১১ থেকে ১২ টাকার বেশি হতে পারে না। অর্থাৎ খুচরো বাজারে বিক্রি হচ্ছে প্রায় নয় টাকা লাভ রেখে। অর্থাৎ একদিকে চাষিও দাম পেল না, অপরদিকে ক্রেতাও বেশি দাম দিল। এরই সঙ্গে মজুত আইনকে হাতিয়ার করে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বা ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে স্টোর খালি করার নির্দেশ জারি করে চাষিকে বাধ্য করা হলো লোকসানে নিজের উৎপাদন বিক্রি করতে। অথচ প্রত্যাহৃত কৃষি বিলে সুযোগ ছিল এই বাজারের আকার বাড়ানোর। যার ফলে অধিক ফলনের দরুন চাষির ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমানো যেত।

এ তো গেল বাজারের চিত্র। এবার একটু পঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষির তুলনামূলক আলোচনা করা যাক বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে। এই আলোচনাটি এই কারণেই জরুরি, কারণ আমাদের রাজ্যের রাজনীতিকরা বিশেষ করে মমতা ব্যানার্জি বারেবারেই এই আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছেন। সেই কারণেই আমাদের একটু খতিয়ে দেখা দরকার এই দুই রাজ্যের প্রকৃত চিত্র। তার থেকেই হয়তো আমরা এই বিল বাতিলের ফলে কারা লাভবান হলো সেই উত্তরটিও খুঁজে পাব।

এফ সি আই ২০১৯-২০২০ সালে পঞ্জাব থেকে প্রায় ১০৮.৭৬ লাখ মেট্রিক টন ধান কিনেছে। সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিয়েছে মাত্র ১৮.৩৮ লাখ মেট্রিক টন। আগে

এই পরিমাণ আরও কম ছিল। ২০১৫ থেকে একটু বেড়েছে। অর্থাৎ সরকারের দেওয়া ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের পুরো সুবিধাটাই পঞ্জাব পাচ্ছে। আজ যদি কেন্দ্রীয় সরকার বলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যকে আইন করে বাধ্যতামূলক করা হবে, কিন্তু এফ সি আই বা অন্যান্য সরকারি এজেন্সি ফসল কিনবে উৎপাদনের রেশিও অনুযায়ী—অর্থাৎ যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ সবথেকে বেশি ধান উৎপাদন করে তাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেশি পরিমাণ ধান কেনা হবে, দেখবেন এই আন্দোলনজীবীরাই তার বিরোধিতা করছে। আর তাদের সমর্থন করছে 'বাংলার মেয়ে'।

বামেরা বলে তারা নাকি অপারেশন ভূমিসংস্কার করে কৃষির প্রভূত উন্নতিসাধন করেছে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু এখনও আলুর বীজের জন্য পঞ্জাবের উপরে নির্ভরতা, মাত্র ৫১ শতাংশ জমি সেচের আওতাধীন হওয়া, ক্যানেল ইরিগেশানের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ ৮.৮৬ লাখ হেক্টর থেকে কমে ৫.৬ লাখ হেক্টরে এসে দাঁড়ানো—কোনটিই এই উন্নতি সাধনের বিজ্ঞাপন নয়। অপারেশান ভূমিসংস্কার করে ক্ষুদ্রচাষিকে জমিতে চাষের অধিকার দেওয়া হলো খুবই ভালোকথা, কিন্তু তার পরে তাকে তো পরিকাঠামোও দিতে হবে। উৎপাদন যেখানে আছে সেখানে বাজার থাকবে। কৃষককে সেই বাজারের সুবিধালাভের সুযোগ করে দিতে হবে। এগুলি অত্যন্ত সাধারণ কথা। কিন্তু এই সাধারণ বিষয়গুলিই করা হলো না। এমন নয় যে যারা অপারেশান ভূমিসংস্কার করেছিলেন তারা এগুলি জানতেন না। কিন্তু তারা এতে উৎসাহী ছিলেন না। কারণ তাদের অপারেশান ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্যটি কৃষি সংক্রান্ত ছিল না। তা একান্তই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র করে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির চল ছিল তাকে শেষ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

তৃণমূলের অবস্থাও এর থেকে আলাদা কিছু নয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবর্ষে সারা দেশে নতুন ৮.৪ লক্ষ হেক্টর এবং ২০১৭-২০১৮ সালে নতুন ৯.২১ লক্ষ হেক্টর কৃষিজমি চলে আসে কৃত্রিম সেচের আওতায়। অবাক করার কথা হলো পশ্চিমবঙ্গের মতো কৃষিপ্রধান রাজ্যে ওই অর্থবর্ষে মাত্র ৫১১৮০ হেক্টর জমি নতুন ভাবে সেচের আওতায় আসে আর ওই দুই অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৩৮.৫০ ও ৪৮ কোটির একটা বড়ো অংশ ফেরত চলে যায়। অপরদিকে পঞ্জাবে দেখুন, সেখানে ৯৮ শতাংশ জমিই সেচের আওতাভুক্ত। সেইসঙ্গে আছে এক উন্নত মান্ডি নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে সেখানকার অধিকাংশ কৃষক এমএসপিতে ফসল বেচেন। স্বাভাবিক তারা বিএমডব্লু, মার্সিডিজ চেপেই আন্দোলন করতে যাবে। এর ঠিক উলটো চিত্র পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের। ৫০ শতাংশ কৃষকের কাছেই যেহেতু কিষান ক্রেডিট কার্ড নেই, ফলে তারা কৃষি লোনের সুবিধাও নিতে পারে না। ২০১৮-১৯ সালে ব্যাঙ্কগুলি কৃষি লোনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল ৬৪ হাজার কোটি টাকা, কিন্তু মাত্র ৬ হাজার কোটি টাকারই লোন ডিসবার্স করা সম্ভব হয়। এমনকী কিষান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যে সব ভরতুকি তারা পেতে পারেন তাও পাচ্ছেন না।

এবার বলুন এতো তফাত থাকা সত্ত্বেও, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের পুরো সুবিধা পাঞ্জাব পাওয়ার পরেও কী করে পঞ্জাব আর পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের স্বার্থ এক হয়? আবার দেখুন এই বিলে চুক্তি ভিত্তিক চাষের কথা বলা হয়েছিল। এটিও কোনও নতুন কথা নয়। বরং দেশের মধ্যে চুক্তিভিত্তিক চাষের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী রাজ্য ছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রথম পেপসি কোম্পানিকে অনুমতি দেন এই চুক্তি ভিত্তিক চাষের। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রায় ১১০০০ হাজার চাষি ৯৫০০ একর জমিতে পেপসি আলুর চাষ করেন। তৃণমূল বা বামেদের কি ক্ষমতা আছে বলার যে পেপসি আলুচাষ কৃষক বিরোধী, তাই এই চাষ বন্ধ করা হবে?

ভূমিসংস্কারের পরে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ক্রমশ অন্তর্হিত হয়েছে। অপারেশান বর্গার পরে অধিকাংশ বড়ো জমির মালিকই চাষে উৎসাহ হারিয়েছেন। এক সময় জমি ছোট ছোট প্লটে বেচে দিয়েছেন। সেই জমির অধিকাংশই পরিবর্তিত হয়ে বাস্তু জমি হয়ে গেছে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা কেন্দ্রিক অর্থনীতির জেরে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তশ্রেণী ক্রমশ শহরমুখী হতে হতে এক সময় তাদের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। ফলে তারাও জমিতে বিনিয়োগ বন্ধ করেছেন। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষিকে লাভজনক পেশায় পরিণত করা, কিন্তু সরকার সেক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ। সেই কারণেই পরিযায়ী শ্রমিকের এই বাড়বাড়ন্ত। দৈনিক ২৩০ টাকা মজুরিতে বা সারাবছরে চার পাঁচ দিন একশোদিনের কাজে তাদের পক্ষে জীবন কাটানো সম্ভব নয়। ছোটো ছোটো জমির মালিকদের জমি থেকে পর্যাপ্ত আয় না থাকার কারণে তাদের পক্ষে বিনিয়োগ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। ফলে কৃষি ক্রমশ একটি অলাভজনক পেশায় পরিণত হয়েছে। যা গ্রামের কিছু প্রান্তিক মানুষ এখনও কোনওক্রমে টিকিয়ে রেখেছেন।

আইন বাতিল হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রেই সবথেকে বেশি আঘাত লাগবে। পরিস্থিতি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। ভয় হয় দশ বছর পরে হয়তো সংরক্ষণের জন্য আবারও নতুন কোনও উদ্যোগ সরকারকে নিতে হবে। তাই আখেরে এই আইন বাতিল হওয়ার ফলে একদিকে যেমন পঞ্জাবের জোতদারদের লাভ হলো তেমনই ক্ষতি হলো পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রের। □

নোবেল-এর দরবারে বাক্‌স্বাধীনতার স্বীকৃতি

সনাতন রায়

'সিম্বল অব ডেমোক্রাটিক রেজিস্ট্যান্স' হিসেবে সুবিখ্যাত জার্মান সাংবাদিক কার্ল ভন ওসিয়েৎকি ১৯৩৫ সালে যখন বাক্‌স্বাধীনতা এবং বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার অন্যতম যোদ্ধা হিসেবে নোবেল পুরস্কার জিতে নিয়েছিলেন সেদিনের বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপটটি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

কিন্তু অবিশ্বাস্য রকমের এক সুখবার্তা হলো— যেদিন থেকে ৮৬ বছর পর সেই বাক্‌স্বাধীনতার যোদ্ধা হিসেবেই আবার সেই নোবেল পুরস্কার জিতে নিলেন দুই সাংবাদিক ফিলিপাইন্সের মারিয়া রেসা এবং রাশিয়ার দিমিত্রি আন্দ্রেইভিচ মুরাতভ।

লড়াইটা ১৯৩৫-এর থেকে খুব একটা স্বতন্ত্র ছিল না। বরং বলা যায়, অনেকটাই কঠিন ও দুস্তর ছিল সেই লড়াইয়ের দুর্গম পথ। কারণ নতুন শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে লড়াইটা শুধু বাক্‌স্বাধীনতার স্বপক্ষেই ছিল না। ছিল দুর্নীতি, ফেক নিউজ, বেআইনি গ্রেপ্তারি, লোকঠকানো ভোটবাজি, পুলিসি অত্যাচার, ড্রাগ মাফিয়া বাহিনীর উৎপাত আর সামগ্রিকভাবে চলতি অমানবিক রাজনীতির বিরুদ্ধেও। রেসা লড়াইটা লড়েছেন নিউজ আউটলেট র‍্যাপলারের সিইও-র ভূমিকায়। আর মুরাতভ লড়েছেন স্বাধীন রাশিয়ান সংবাদপত্র নোভায়া গেজেতার অন্যতম প্রধান সম্পাদক হিসেবে। গোটা বিশ্বের ৩৭টি দেশে যখন সাংবাদিকতার দ্বার পুরোপুরি রুদ্ধ অথবা চূড়ান্ত অবদমনের শিকার এবং যখন বিশ্বের ৫৯টি দেশ সাংবাদিকতার স্বাধীনতার জন্য হাঁসফাঁস করছে, মুক্তি খুঁজছে শ্বাসরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে, তখন নিঃসন্দেহে ২০২১-এর নোবেল কমিটি দুই সাংবাদিককে তাঁদের সংবাদপত্রের মুক্তির সংগ্রামে অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন--- স্বৈরাচারী শক্তি যতই সংবাদমাধ্যমের গলা টিপে হত্যার চেষ্টা করুক না কেন মনে রাখতে হবে বাক্‌স্বাধীনতা এবং তথ্যের স্বাধীনতাকে কারাবন্দি করে রাখা যাবে না। কারণ এগুলিই গণতন্ত্রের প্রধান দুই শর্ত। মারিয়া রেসার ডিজিটাল মিডিয়া র‍্যাপলার-এর প্রথম ও প্রধানতম 'পাখির চোখ' ছিল তদন্তমূলক সাংবাদিকতা এবং দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে মারিয়া সেটাই করে গেছেন প্রশাসন ও দুর্নীতিবাজদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই। তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে রদ্রিগো দুতের্তের পুলিশ। প্রশাসনিক স্তরে, মামলায় ফাঁসানো হয়েছে তাঁকে, কিন্তু থমকে দাঁড়াননি।

দিমিত্রি মুরাতভ

মারিয়া রেসা

লড়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে।

রেসার এই লড়াইয়ের পাশে প্রায় হাত ধরাধরি করেই লড়াই চালাচ্ছিলেন দিমিত্রি মুরাতভ রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে। লড়াইটা অনেকদিনের। নোভায়া গেজেতার পাতায় চেচনিয়ার যুদ্ধের খবর করতে গিয়েই মৃত্যু হয়েছিল আন্না পলিৎকোভস্কিয়ার। কমিউনিস্ট জমানা শেষ হওয়ার পরেও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষুদ্রাংশ রাশিয়া গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারেনি। দিমিত্রি মুরাতভ সেই লড়াইটাই লড়েছেন যা ছিল রাশিয়ার জনসমর্থনে পুষ্ট। তাই দিমিত্রি জয়টাকে 'নিজের' না বলে বলেছেন, জয়টা জনগণের ও নোভায়া গেজেতার। চেচনিয়ার যুদ্ধে হত আন্না পলিৎকোভস্কিয়ার দীর্ঘ লড়াইকে সম্মান জানিয়ে দিমিত্রি বলেছেন, 'দেশে মানবাধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছিল। সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল প্রশাসন। আন্না ছিল সেই পদক্ষেপের প্রতিবাদী।' নোবেল পুরস্কারটা দেওয়া হলো যেদিন ঠিক তার আগের দিনই তাঁর মৃত্যুর ১৫ বছর পার করল যা কাকতলীয়ভাবে পুতিনের জন্মদিনও বটে। নোভায়া গেজেতা এমন বহু বলিদানের সাক্ষী থেকে গেছে দীর্ঘকাল ধরে। ফলত ক্রেমলিন থেকে সরকারি মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভকে বলতেই হয়েছে— 'দিমিত্রি মুরাতভ একজন প্রতিভাশালী ও সাহসী ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর আদর্শে দৃঢ় আজীবন।'

সেই কথাটাই বলেছে নরোয়েজিয়ান নোবেল কমিটিও--- 'রেসা ও মুরাতভ সেইসব সাংবাদিকদেরই প্রতিনিধি যাঁরা নিজেদের আদর্শের জন্য মেরুদণ্ড সোজা রাখেন।' বিশ্ব সাংবাদিকতার দরবারে তাই রেসা ও মুরাতভ সেই সব বিস্ময় সৃষ্টিকারী সাংবাদিকদেরই প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

হলেন নোবেল পুরস্কার জিতে নিয়ে।

রেসা ও মুরাতভ যখন এদের বাক্‌স্বাধীনতা এবং তথ্যের স্বাধীনতার লড়াইয়ের স্বীকৃতি জিতে নিয়ে নোবেল সম্মানে সম্মানিত হলেন, ঠিক তখনই বিশ্বব্যাপী প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্স কী বলছে? আসুন একবার চোখ বুলিয়ে নিই সেই হিসাবটাতেও।

বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থানরত ১৮টি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১৫০ জন প্রতিনিধির সমীক্ষা এবং সাংবাদিক, গবেষক, জুরি ও মানবাধিকার কর্মীদের বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধিদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পাওয়া হিসাব অনুযায়ী এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্তত ১১টি দেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা অটুট। এগুলি হলো--- নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, কোস্টারিকা, নেদারল্যান্ডস, জামাইকা, নিউজিল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, পর্তুগাল ও সুইজারল্যান্ড। লক্ষ্য করার বিষয়, নোবেল পুরস্কারটি প্রদান করে নরোয়েজিয়ান কমিটিই। আর যেসব দেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা শব্দটিই অস্তিত্বহীন সেই তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে উত্তর কোরিয়া,তুর্কমেনিস্তান, চীন এবং ক্রমান্বয়ে অন্য দেশগুলি হলো--- এরিত্রিয়া, নিজবুতি, ভিয়েতনাম, ইরান, সিরিয়া, লাওস কিউবা ও সৌদি আরবিয়া। সংবাদমাধ্যম যেসব দেশে এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, সেগুলি হলো--- ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড, কোস্টারিকা, সুইজারল্যান্ড ও সুইডেন। এই ৯টি দেশের মধ্যে আবার সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। তারপর সুইজারল্যান্ড। এই তালিকায় আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তান কোথায়? পাকিস্তান রয়েছে ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৪৫তম স্থানে।

আর ভারতবর্ষ?

তাহলে বার করা যাক ঝোলাবন্দি ইঁদুর ছানাকে। যে দেশ ৭৫ বছর আগে স্বাধীন হয়েছে এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী দেশ হিসেবে নিজেকে ঘোষিত অবস্থানে নিয়ে গেছে, সেই

পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ সংবাদপত্রই আজ সরকারের মুখপত্র, দালাল ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে প্রতিদিন মানুষ দলে দলে সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে মুখ ঘোরাচ্ছে। এই পরিস্থিতির আদৌ কোনো পরিবর্তন হবে কিনা, তা শুধু ভবিষ্যৎই বলবে।

দেশ ভারতবর্ষে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এখন তলানিতে। প্রেস ফ্রিডম ইনডেক্সে ভারতের স্থান ১৪২। পাকিস্তানের থেকে মাত্র তিনটি স্থান নীচে। অর্থাৎ তালিকাই বুঝিয়ে দেয়--- ভারতবর্ষ গণতন্ত্র কতটা মজবুত এবং ভারতীয় গণতন্ত্রে গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ প্রেস বা সংবাদমাধ্যমে ঠিক কতখানি বন্দিদশায় আবদ্ধ থেকে কাজ করে। এবং বলাই বাহুল্য, এর জন্য দায়ী দেশের রাজনীতি ও রাজনীতিবিদরাই এবং অবশ্যই কিয়দংশে সংবাদমাধ্যমের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন মালিক পক্ষ। কারণ সংবাদমাধ্যম এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট সেক্টরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অথবা মূলধন মাত্র। খবর সেখানে মুখ্য নয়।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এ ব্যাপারে আরও বেশিমাত্রায় ভুক্তভোগী। কারণ গত ৫৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতবর্ষের সবচেয়ে উন্নত সংবাদমাধ্যমের ভিত্তিভূমি, উন্নত সংস্কৃতি ও শিক্ষার ভিত্তিভূমি পশ্চিমবঙ্গই সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছে নিম্ন মানসিকতার রাজনীতির। যে পশ্চিমবঙ্গে এক সময় জন্ম নিয়েছিল দেশের প্রথম সংবাদপত্র, প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র, প্রথম হিন্দি ও উর্দু ভাষায় সংবাদপত্র, প্রথম মহিলাদের জন্য পত্রিকা, যে রাজ্য থেকেই সংবাদপত্র জন্ম দিয়েছে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতার লড়াইয়ের--- আজ সেই সংবাদমাধ্যমগুলিই সরকারি চাপের কাছে নতিস্বীকার করে নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে জনগণের অভিশাপ কুড়োচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সিংহভাগ সংবাদপত্রই আজ সরকারের মুখপত্র, দালাল ও জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে প্রতিদিন মানুষ দলে দলে সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে মুখ ঘোরাচ্ছে। এই পরিস্থিতির আদৌ কোনো পরিবর্তন হবে কিনা, তা শুধু ভবিষ্যৎই বলবে।

কিন্তু একটা সত্যকে স্বীকার করতেই হবে--- গৌরকিশোর ঘোষ কিংবা সন্তোষকুমার ঘোষের পর আন্তর্জাতিক মানচিত্রে সাংবাদিক হিসেবে উল্লেখ্যনীয় ব্যক্তিত্ব তেমনভাবে কাউকে চোখে পড়েনি, পড়ছেও না। অতএব অদূর ভবিষ্যতে এ রাজ্য থেকে কোনও রেসা বা মুরাতভ বাক্‌স্বাধীনতার লড়াইয়ে জিতে নোবেল জিতবেন কিনা, তা কেবল ভবিষ্যতই বলতে পারবে। □

With Best Compliments from :

A

Well wisher

কল্যাণ ভবনে গুরুমাতা কমলী সরেনের সংবর্ধনা

গত ১১ নভেম্বর পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের প্রাদেশিক কার্যালয় কল্যাণ ভবনে কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত গুরুমাতা কমলী সরেনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক অতুল যোগ, যোগেশ বাপট, সত্যেন্দ্র সিংহ এবং পশ্চিমবঙ্গের সভানেত্রী স্নেহলতা বৈদ্য। সমাজসেবামূলক কাজের জন্য পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছেন মালদার গাজোলের প্রত্যন্ত কোটালহাটি গ্রামের কমলী সরেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রপতি তাঁর হাতে সম্মানসূচক পদক তুলে দেন। এলাকার জনজাতিদের পুরনো ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনা, তাঁদের উন্নয়ন ও পুরনো রীতির

চিকিৎসা পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দুঃস্থ মানুষদের চিকিৎসা করায় তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। গত পঁচিশ বছর ধরে তিনি এই কাজ করে চলেছেন।

সোদপুরে কর্মযোগীর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২১ নভেম্বর প্রথমবার বিশিষ্ট সেবা সংস্থা কর্মযোগীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সোদপুরের কামধেনু গোশালায়। প্রদীপ প্রজ্বলন, গীতাপাঠ ও সমবেত গীতের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক ড. বিজয় আঢ্য ও রাষ্ট্রীয় সেবাভারতীর অখিল ভারতীয় সংযোজক গুরুশরণ প্রসাদ। সভয় অংশগ্রহণ করেন কর্মযোগীর ৫৩ জন মহিলা ও ১৬০ জন পুরুষ কার্যকর্তা। বিগত বছরের প্রতিবেদন পাঠ করেন অসীম মণ্ডল। চলতি বছরের আর্থিক বাজেট পেশ করেন সমক ব্যানার্জি। সভায় স্মরণিকা প্রকাশ করেন শ্রীগুরুশরণ প্রসাদ। দ্বিতীয় ভাগে অনুষ্ঠিত হয় পিতৃ-মাতৃ পূজন। সভা সঞ্চালনা করেন কেকা ঘোষ মুন্সী ও রূপক ঘোষ।

রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের দীপাবলী প্রীতি সম্মেলন

কলকাতার রাম-শরদ কোঠারী স্মৃতি সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১৪ নভেম্বর দীপাবলী প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় নাগৌর নাগরিক সঙ্ঘের সভাগারে। সংস্থার অধ্যক্ষ রাজেশ আগরওয়াল(লালা) সদস্যদের

অভিনন্দন জানান এবং আগামী কার্যক্রমের বিষয়ে অবগত করান। হুতাত্মা কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়ের ভগ্নী পূর্ণিমা কোঠারী সবাইকে দীপাবলীর শুভকামনা জানান।

কুমারসভা পুস্তকালয়ের কোষাধ্যক্ষ অরুণ মল্লবত হুতাত্মা কোঠারী ভ্রাতৃদ্বয়কে স্মরণ করে সংস্থার সবাইকে অযোধ্যা দর্শনের আবেদন জানান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করে রজত চতুর্বেদী।

মা সি ক রা শি ফ ল

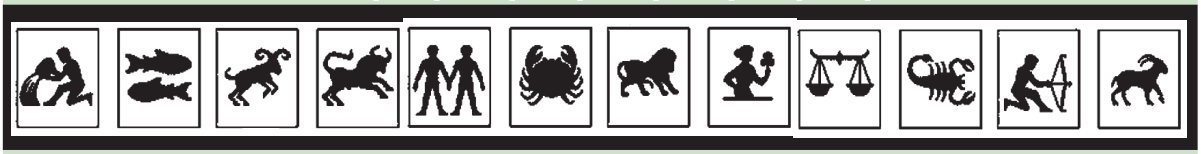

রাশিফল ডিসেম্বর মাস

অধ্যাপক অমিত শাস্ত্রী

মেষ : কর্মে পরিবর্তন, চেষ্টা সত্ত্বেও সামাজিক প্রতিষ্ঠাতে বাধা, ফলস্বরূপ মানসিক কষ্ট। ভ্রমণ যোগ, যারা বাসস্থান নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত তাদের বাসস্থান পরিবর্তনের যোগ। লটারি বা ফাটকার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও মনঃকষ্ট। সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা, দাম্পত্য মনোমালিন্য, মাসের মধ্যবর্ত সময় থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। মা-বাবার শারীরিক অসুস্থতা, কর্মস্থলে শত্রুতা বৃদ্ধি ও সাফল্যে বাধা।

বৃষ : শারীরিক অসুস্থতায় ভোগান্তি। কোনো মহিলা কর্তৃক উন্নতিতে বাধা, কথাবার্তার জন্য শত্রুতার সৃষ্টি হতে পারে। জাতকের মধ্যে অর্থনৈতিক ফাটকার মনোবৃত্তি আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা, পিতা মাতার শারীরিক অসুস্থতার কারণে উদ্বেগ, দূর ভ্রমণের যোগ কিন্তু ভ্রমণে বাধাপ্রাপ্তি, অতিরিক্ত সঞ্চয় বা কৃপণতার কারণে নিজের অবনতি।

মিথুন : শারীরিক অসুস্থতা ভোগ ও শত্রুতা বৃদ্ধি, মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি, ভাই-বোন বা প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য, ছোটোখাটো ভ্রমণের যোগ কিন্তু ভ্রমণে অশান্তি হতে পারে। নিজের কারণে ব্যয়বাহুল্য। সন্তানের শারীরিক অসুস্থতার জন্য চিন্তা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সুখ, হঠকারিতার জন্য স্বাস্থ্যহানি। পিতার নিকট হতে দুঃখ। কর্মক্ষেত্রে অধীনস্থ কর্মচারীর জন্য ঝামেলা, বন্ধু হতে কষ্ট বা মনোমালিন্য।

কর্কট : নিজের দোষে স্বাস্থ্যের হানি হতে পারে, মানসিক চঞ্চলতা বা নিষ্ঠার কারণে কোনো কাজ সম্পন্ন না হওয়া। অহেতুক ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়া। আর্থিক খরচ বৃদ্ধি, বাক্যলাপের কারণে পারিবারিক জীবনে অশান্তি, বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো গুপ্ত উপায় বা অপ্রত্যাশিত অর্থ লাভ, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি।

সিংহ : শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে পারে। মানসিক অস্থিরতার জন্য চঞ্চলতা, ভাই-বোনের সঙ্গে বা প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য এবং পরিবারে সুখের ব্যাঘাত। সন্তানের ব্যাপারে সুখপ্রাপ্তি। বংশগত রোগের কারণে ভোগান্তি, চোখ বা সুগারের সমস্যা, কর্মক্ষেত্রে অধীনস্ত কর্মচারীর সঙ্গে মনোমালিন্য, বিবাদে জয়লাভ, স্ত্রী বা স্বামীর অসুস্থতার কারণে দুশ্চিন্তা।

কন্যা : যে কোনোদিকে একাগ্রতা ও সাহসের কারণে জাতকের নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ। ভ্রমণে আনন্দলাভ, ভাই-বোনের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্কের বিকাশ, পড়াশুনায় কৃতিত্বের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া ও শুভ যোগাযোগ, তবে সন্তানকে নিয়ে চিন্তা থাকবে। তার আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়া, সন্তান বংশগত কোনো রোগের কারণে ভুগতে পারে।

তুলা : হঠকারিতার কারণে শারীরিক অসুস্থতা, তবে নিজের কৃতিত্বে সাফল্য লাভ। অর্থনৈতিক দিকে শুভ যোগাযোগ। প্রতিবেশীর সামাজিক কাজে যোগদান। ব্যবসায়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্তি। বাবা-মায়ের অসুস্থতা। পড়াশোনাতে বিঘ্ন ঘটবে। ভ্রমণে ক্ষতি হতে পারে। লিভারজনিত সমস্যায় ভুগতে পারেন।

বৃশ্চিক : কোনো বিশেষ কারণে মানসম্মান বৃদ্ধি। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করে আত্মবিশ্বাসের বৃদ্ধি। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ। সহজে অর্থলাভ ও ব্যবসায়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেওয়া। ভ্রমণে আনন্দ ও অর্থ দুই-ই লাভ। মাতার দ্বারা লাভবান হতে পারেন। সন্তান কোনো দীর্ঘমেয়াদি রোগে ভুগতে পারেন।

ধনু : কথাবর্তার মধ্যে উদাসীনতা। গুপ্ত ভাবে অর্থ উপার্জন। পড়াশোনায় আশানুরূপ রেজাল্ট না হওয়া। মায়ের দ্বারা লাভ, অর্থনৈতিক ব্যাপারে আশানুরূপ ফল লাভ না হওয়া। বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। দাদার কারণে মনোকষ্ট। দূর ভ্রমণের যোগাযোগ।

মকর : সামাজিক শিষ্টাচার বা লোকাচারের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা, পরিবারে কোনো শুভ কর্ম হতে পারে। শারীরিক অসুস্থতা ভোগ, বাধার মধ্যে দিয়ে অর্থলাভ। গ্যাসজনিত সমস্যায় ভুগতে পারেন। কর্মস্থলে গোলযোগ ও শত্রুতা বৃদ্ধি। সমস্যার মধ্যে দিয়ে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ। নিজের কারণে লোকসান। বন্ধু দ্বারা প্রতারিত।

কুম্ভ : নিজের শারীরিক অসুস্থতার জন্য চিন্তা। প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা। দীর্ঘ কোনো রোগ নিয়ে ভোগান্তি। অতি সহজে অর্থ লাভ। কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ। কার্যসিদ্ধির জন্য কূটবুদ্ধির প্রয়োগ। দাম্পত্য জীবনে সমঝতার অভাব। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিলাভ।

মীন : শারীরিক অসুস্থতায় ভুগতে পারেন। অর্থনৈতিক সাফল্যে বাধা। পরিচিত ব্যক্তির দ্বারা উন্নতিতে বাধা। বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য। শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। পিতার সঙ্গে মতের অমিল হওয়া ও পিতার অসুস্থতা। অতিরিক্ত আড়ম্বরের জন্য ব্যয়। ছোটোখাটো অশান্তির জন্য কোনো কাজ বন্ধ হতে পারে। □

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ১৬।।

অন্ধদের স্কুলের জন্য গুরুজী অর্থ সংগ্রহ শুরু করলেন।

গুরুজী মাঝে মাঝে ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষ পাঠ করে অন্ধ বন্ধুদের শোনাতেন।

বিয়ের সম্বন্ধ আসতে শুরু করল—

একদিন গুরুজী বাবাকে চিঠি লিখলেন—

আমার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই। তাতে আমি সুখী হব না। তবে যদি জোর করেন, আপনার কথা অমান্য করতে পারব না বলেই মেনে নিতে হবে।

গুরুজী তাঁর ভাইয়ের কাছে জ্যোতিষ ও হস্তরেখাবিদ্যা শিখলেন।

আইন পড়ার সময় একবার গুরুজীকে সঙ্ঘের কাজে রামটেক যেতে হলো। তিনি বসেই হিন্দু বিবাহ আইন পড়তে শুরু করলেন।